সেপ্টেম্বর ২০২২ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

হাসির রাজার দুঃখ কষ্ট

হৃদয় বিশ্বাস রিক, চতুর্থ শ্রেণি, বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজ

যাহরা তাসনুমা তন্বী, দ্বাদশ শ্রেণি, শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, শ্রীবরদী

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ২৮ শে সেপ্টেম্বর আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬ তম জন্মদিন। জন্মদিনে আমরা তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ১৯৪৭ সালের এই দিনে তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের আদরের বড়ো সন্তান তিনি। তোমরা কি জানো, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শুধু একজন প্রধানমন্ত্রীই নন তিনি একজন লেখকও। লিখেছেন বেশ কিছু বই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– শেখ মুজিব আমার পিতা, সবুজ মাঠ পেরিয়ে, ওরা টোকাই কেন, Miles to go, The Quest for vision 2021 (Two Volumes) ইত্যাদি।

ছোট্ট বন্ধুরা, হাসতে নিশ্চয়ই আমাদের সবারই ভালো লাগে। হাসির গল্প পড়তে, হাসির নাটক, সিনেমা দেখতে, বন্ধুদের সাথে হাসি মজা করতে তোমরা খুব পছন্দ করো তাই না। সারা বিশ্বে অনেক মানুষ আছে যারা আমাদের হাসায়। তাদের অঙ্গভঙ্গি, কথা, আচরণ আমাদের হাসির খোরাক জোগায়। এমনই একজন অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন, যিনি কৌতুকের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরতেন। এসব হাসির মানুষগুলোর জীবন কেমন সে সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই। নবারুণ এবার তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছে হাসির এক রাজার গল্প। পড়ে দেখো কেমন লাগে, মতামত জানিও।

২৪শে সেপ্টেম্বর মীনা দিবস এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস'। দিবসগুলো আমরা গভীর মমতার সাথে প্রতি বছর পালন করি। মীনার মতোই স্বপ্ন দেখুক আমাদের কন্যা শিশুরা। ভালো থেকো সবাই। নবারুণ পড়বে, নবারুণের সাথে থাকবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

জন্মদিনে আমাদের ভালোবাসা/খালেক বিন জয়েনউদদীন ০৩
শৈশবের স্বপ্নরঙিন দিনগুলো/রফিকুর রশীদ ০৯
কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য নয়/লাভলী আক্তার ১৭
হাসির রাজার দুঃখ কষ্ট/ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ ১৯
আদুরে প্রাণী কোয়ালা/মঈনুল হক চৌধুরী ৩৯
পজেটিভ চিন্তার সুফল/তানভীর ইসলাম ৪৮
ঋতুরানি শরৎ/হারুন-উজ-জামান ৪৯
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস/আব্দুস সাত্তার খান ৫১

গল্প

তালের পিঠা/প্রজীৎ ঘোষ ১২
বাতুলের বিড়াল/আশরাফ পিন্টু ১৫
অনলের দাদু/শিবশঙ্কর পাল ৩৩
পাসওয়ার্ড/মুহাম্মদ ইসমাঈল ৩৭
সাপ ও বটগাছ/অমিত কুমার কুণ্ডু ৪১

ভ্রমণকাহিনি

হারিয়ে যাওয়া নীল সমুদ্র/মীম নোশিন নাওয়াল খান ৪৪

কবিতা ও ছড়া

০৭ শাফিকুর রাহী
০৮ মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ/জিশান মাহমুদ
১৬ ওমর ফারুক নাজমুল
৪৬ গাজী আরিফ মান্নান/নূর আলম গন্ধী/আনোয়ারুল হক মিন্টু
৫০ তোফাজ্জল হোসেন তুহিন

ছোটোদের ছড়া

০৮ রুপা আক্তার
৪৫ নাঈমুল হক লিটন
৪৭ হামিদ রিপন/ওলি মুন্সী/শাহজাহান মোহাম্মদ
৫০ জেরিন আলম

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : হৃদয় বিশ্বাস রিক/যাহরা তাসনুমা তন্বী
৩৮ সাবরিনা ইসলাম
৫৭ মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ/সাবিহা তাসবীহ,
৬৩ আফরা তাহমীদ জারা/আয়ান হক ভূঁইয়া
৬৪ সামিকা নূর ইমি/ অর্থি

সাফল্য প্রতিবেদন

৫২ অপরাজিত বাবা ও ছেলে/মেজবাউল হক
৫৩ সবুজ পাসপোর্ট গার্ল/জান্নাতে রোজী
৫৪ শিশুদের করোনার টিকা/মো. জামাল উদ্দিন
৫৫ শিশুদের নতুন ওয়েবসাইট/শাহানা আফরোজ
৫৬ নতুন উচ্চতায় আইফেল টাওয়ার/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৮ মীনার লড়াই/হোমায়েদ নাসের
৫৯ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

জন্মদিনে আমাদের ভালোবাসা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি।
আটাশে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন
তিনি আমাদের লোকলক্ষ্মী শেখ হাসিনা।
জন্মদিনে অর্পণ করি শ্রদ্ধাঞ্জলি
ও জানাই গভীর ভালোবাসা।
শেখ হাসিনার জন্মদিন ও
জন্মবছর ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ খ্রি.
তাঁর বাবার নাম শেখ মুজিবুর রহমান।
মায়ের নাম শেখ ফজিলাতুন নেছা রেনু।

শেখ হাসিনার শৈশব ও কৈশোর কাটে-জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায়। শৈশবের পাঠ চুকিয়ে ঢাকায় এসে প্রথমে নারী শিক্ষা মন্দির, আজিমপুর সরকারি মহিলা বালিকা বিদ্যালয়, বদরুন্নেসা সরকারি মহাবিদ্যালয়, সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁদের দুটি সন্তান জয় ও পুতুল।

ছাত্রীজীবনে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। বাঙালি স্বাধীনতা ও সংগ্রামের উৎস গৃহে বড়ো হয়ে ওঠা। পঁচাত্তরে বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে ছোটো বোন রেহানা ও সন্তানদের নিয়ে জার্মানিতে গমন। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একাত্তরের মিত্রমাতা

ইন্দিরা গান্ধীর মমতায় ভারতে ৫-৬ বছর নির্বাসিত জীবনযাপন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে সকল বাধা উপেক্ষা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ভোট ও ভাতের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম ও আন্দোলন শুরু। ১৯৯৬ সালের ২৩ শে জুন প্রথম ক্ষমতায় আসীন। ২০০৮ সালে আবার তিনি জনগণের নিরঙ্কুশ ভোটে ক্ষমতায় আসীন হন। বর্তমানে তা বিদ্যমান। শেখ হাসিনা চারবারের প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার রূপকার এবং তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। বিগত বছরগুলোয় আমাদের যা কিছু অর্জন তা শেখ হাসিনার আদেশ-নির্দেশ ও উদ্যোগে এসেছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ, উন্নয়নশীল বাংলাদেশ ও আধুনিক প্রযুক্তির বাংলাদেশ গড়ার তিনিই স্থপতি।

তিনি জাতির পিতার খুনিদের সংশোধনীগুলো বাতিল করে সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃস্থাপন করেছেন।

একাত্তর ও পঁচাত্তরের ধরাপড়া খুনিদের বিচার করেছেন, এছাড়া পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ভারতের সঙ্গে শান্তিচুক্তি, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ, নিজ অর্থে পদ্মা সেতু গড়া, ছিটমহল সমস্যার সমাধান, সমুদ্র বিজয়, একুশ ও সাতই মার্চকে জাতিসংঘের স্বীকৃতি, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দান, একাত্তরের মিত্রদের সম্মাননা প্রদান, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষবার্ষিকী পালন, মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদা এবং সামরিকতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্রের অভিযাত্রাকে শক্তিশালী করা।

শিশু আইন প্রবর্তন করা, শেখ রাসেল দিবস পালন করা এবং মেট্রোরেল নির্মাণ। জাতির পিতার জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে সকল প্রকার ভাতা প্রদান।

মোটকথা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানের সকল ক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু তবুও বলতে হয় তাকে চিহ্নিত শত্রুরা স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। একটি চক্র তাকে ২০-২২ বার প্রাণনাশের অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু বিধাতার অপার কৃপায় তিনি বেঁচে আছেন। আর আছে তাঁর দেশের মানুষের অসীম শক্তি-সাহস।

শিশুদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। জাতীয় শিশুদিবসের মূল অনুষ্ঠানটি তিনিই টুঙ্গিপাড়ায় উদ্‌বোধন করেন। শিশুদের কচি-কোমল মুখের মাঝে তিনি খুঁজে বেড়ান অকালে নরঘাতকের হাতে শহিদ ছোটো ভাই রাসেলকে। শৈশব-কৈশোরে তিনি ছিলেন কচিকাঁচার মেলা ও কচিকাঁচার আসরের সদস্য। তিনি সুলেখক। তাঁর প্রবন্ধের ও স্মৃতিচারণার বইগুলো পাঠকনন্দিত। তিনি বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন অনেক সম্মাননা, পুরস্কার ও উপাধি। জাতিসংঘও তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এটা আমাদের জন্য গৌরবের। 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' প্রবন্ধে তিনি শৈশবের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে–

> আমার শৈশবের দিনগুলো ভীষণরকম স্মৃতিময়। আজ সেসব দিনের কথা যেন স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে বার বার ভেসে আসছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছর বড়ো হবে। সেই ফুফুর সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছি। খালের ওপর ছিল বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিন কি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। আমার হাত-পা কাঁপছিল, ফুফুই আমাকে সাহস দিয়ে হাত ধরে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিল। এরপর কখনও ভয় করেনি। বরং সবার আগে আমিই থাকতাম। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে

বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা, পুঁটি, খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসত। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসত কই ও বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষে বাটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আম মাখা পুড়ে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এই আম মাখা পুরে যে না খেয়েছে, সে কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আম মাখা খাওয়া নিয়ে কত মারামারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড়ো তালাবের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বরই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরইটা পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারো পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না, তখন সেই বরইটার জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনও ভুলতে পারলাম কই?

পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছোট্টো ডিঙ্গি নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার দাদার একটি বড়ো নৌকা ছিল। যার ভেতরে দুটো ঘর ছিল, জানালাও ছিল বড়ো বড়ো। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। নৌকার জানালায় বসে নীল আকাশ আর দূরের ঘন সবুজ গাছপালা ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নৌকা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সেই গ্রাম আমার কাছে এখনও যেন সুবাসিত ছবির মতো।

আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর পাশেই আমার দাদা-দাদির কবর- যারা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহমমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তারা মিশে আছে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয় পরিজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায় তাদের বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন সত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

আমাদের যা কিছু অর্জন তা শেখ হাসিনার আদেশ-নির্দেশ ও উদ্যোগে এসেছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ, উন্নয়নশীল বাংলাদেশ ও আধুনিক প্রযুক্তির বাংলাদেশ গড়ার তিনিই স্থপতি

রহমানকে। ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সেই মহাপুরুষকে নিভৃত পল্লির মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু পেরেছে কি?

বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগও পেতাম। তার একটা কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন 'শেষ জীবনে আমি গ্রামে থাকব। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকব'। কথাগুলো আমার কানে এখনও বাজে। গ্রামের নিঝুম পরিবেশে বাবার মাজারের এই পিছুটান আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বার বার আমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আমার শত ব্যস্ততা থাকলেও এবং একটু সময় পেলেই আমি চলে যাই। কেন যে মনে হয় আমার শৈশবের গ্রামকে যদি ফিরে পেতাম! গ্রামের মেঠোপথটা যখন দূরে কোথাও হারিয়ে যায় আমার গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে...। শৈশব ও কৈশোরের স্কুল পাঠ্য বইয়ের গ্রাম সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমার খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেত। 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর' 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোটো গাঁয়', 'বহুদিন পরে মনে পড়ে আজ পল্লী মায়ের' 'কোল', 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ মেঘনা পারের ছেলে আমি', 'ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা', 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে' এসব কবিতার লাইন এখনও মনে আছে।

শেখ হাসিনার জন্মদিন আমাদের কাছে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। তাঁকে ঘিরেই আমাদের পথচলা। আমাদের সকল অর্জনের রূপকার। তিনি আমাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর দীঘল আঁচলের ছায়ায় বাংলাদেশের সকল প্রাণিকূলের বিচরণ। তাঁর মমতাময়ী আচরণ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকলক্ষ্মী হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছুটে যান উপকূল এলাকায়। তবুও বলতে হয় প্রতিকূল পরিস্থিতি, বেদনা ও বিপদের মাঝে শেখ হাসিনা যেমন দৃঢ় চিত্তের অধিকারী, তেমনি প্রকৃতভাবে আবেগময়ী। মানুষের ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় গলে যায়। ছিয়াত্তরতম জন্মদিনে শারদ প্রভাতের জাতক শেখ হাসিনাকে ৭৬টি লাল পদ্মের শুভেচ্ছা। তাঁর পথচলা দীর্ঘস্থায়ী হোক। জয় বাংলা। ■

বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

পরম আপন সাহসিকা

শাফিকুর রাহী

কৃষক ভাইয়ের ভাঙা ডেরায় শনের চালায়;
সুখের ঝিলিক নতুন বধূর রঙিন বালায়।
অন্ধ-অজ পল্লি গাঁয়ে আলোর নাচন
সুখ-আনন্দে মাটির সঙ্গে নিত্য বাচন।
সব খানেতে ডিজিটালের আলোর আভায়
মনটা নাচে; নতুন করে বাঁচতে ভাবায়।

ভোট ও ভাতের অধিকারের শপথ পাঠে;
কার ডাকেতে জাগল মানুষ আঁধার মাঠে।
ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারায় চলতে পথে
চড়বে সবাই সখ্য এবং সাম্য রথে।
সকল ক্ষেত্রে সফলতায় সম্ভাবনায়
কে সে মহান; দূরদর্শী পথ যে দেখায়!

পিতার স্বপ্ন বৈষম্যহীন স্বদেশ গড়ার;
দীক্ষা যে দেয় আঁধার ভেঙে যুদ্ধে লড়ার।
তিমিরনাশী কার ডাকেতে বইল জোয়ার;
কার গরিমায় দুঃশাসনের ভাঙল খোয়াড়!
জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি সাহসিকা-
বীর বাঙালির পরম আপন নির্দেশিকা।

ভয়ার্তকাল স্বজনহারার দুঃখ বুকে
গরিব দুখি নিরন্নদের মলিন মুখে
ভালোবাসার আশার আলোয় ফুটল হাসি
প্রাণের টানে গাইল গীতি স্বদেশবাসী।
অধিকারহীন ছিটবাসীদের আঁধার ঘরে;
কার নেতৃত্বে জ্বলল বাতি; কে সে লড়ে!

নীল সাগরের ঊর্মিমালায়, জোয়ার ভাটায়
স্বমহিমায় বীর দাপটে পাল যে খাটায়।
দেশরত্নের গৌরবোজ্জ্বল অভিযাত্রায়,
স্বদেশপ্রেমে এগিয়ে চলেন ভিন্ন মাত্রায়।
বীর দাপটে পিতার স্বপ্ন সাহস বুকে,
এগিয়ে চলেন শত বাধার আঁধার রুখে।

বিশ্বনেতা- দেশরত্ন শেখ হাসিনা,
পদ্মা সেতু বিনির্মাণে হয় না তুলনা!
আধুনিক এ বাংলাদেশে রূপকারে-
দিনবদলের লাগল দোলা পদ্মা পাড়ে।
বীর জনতার প্রিয় নেতা সাহস হাঁকায়
পদ্মা সেতু ছড়ায় আলো গর্ব গাথায়।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

মধুমতির কন্যে তুমি
শরৎকালের ফুল
স্বপ্ন-আশার জোছনাপরি
পদ্মা পাড়ের কূল।

শাপলা-দোয়েল তোমার নামে
ফোটে এবং গায়
মাল্লা-মাঝি পাল খাটাল
জন্মদিনের বায়।

মধুমতির কন্যে তুমি
শেখ হাসিনা নাম-
ভালোবাসার আশীষ ঝরে
এই হৃদয়ে ধাম।

লক্ষ-কোটি জন-জনতা
তোমার ছায়ায় হাঁটে
জন্মদিনের শুভেচ্ছাটা
শ্লোক-ছড়ায় কাটে।

অসীম নেতৃত্ব

রুপা আক্তার

জাতির পিতার কন্যা তিনি
শেখ হাসিনা তাঁর নাম
দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে
সাহসী নেতৃত্বের সুনাম।

দিনরাত ব্যস্ত থাকেন
সোনার বাংলা গড়তে
উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে
দেশের প্রতিটি পরতে।

নিজের টাকায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু
করেছেন তিনি নির্মাণ
দেশের মানুষ ভুলবে না
তাঁর অসীম এই অবদান।

৭ম শ্রেণি, বারহাট্টা হাই স্কুল, নেত্রকোণা

মুজিব কন্যা

জিশান মাহমুদ

লাল-সবুজের এই দেশেতে
ফুটে হাজার ফুল
কারো সাথে শেখ হাসিনার
নাই যে কোনো তুল।
গরিব-দুখির জন্য সদা
কাঁদে তোমার মন
কেমনে তাদের ভালো হবে
ভাবো সারাক্ষণ।
হাজার হাজার গরিব-দুখির
মুখে ফুটাও হাসি
মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা
তোমায় ভালোবাসি।

শৈশবের স্বপ্নরঙিন দিনগুলো

রফিকুর রশীদ

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদেরও সবারই আছে একটি করে জন্মদিন আর একটি মাত্র জন্মস্থান। বড়ো হতে হতে অনেকেই নিজের জন্মস্থান থেকে দূরে চলে যায়, কাজের চাপে বা অন্য কোনো বাস্তবতার কারণে অনেকেই আর জন্মস্থানে ফিরে আসতে পারে না। তবে বুকের গভীরে জন্মস্থানের নানান স্মৃতি সবুজ ঘাসের গালিচা হয়ে বেঁচে থাকে সারাজীবন। জন্মস্থান থেকে দূরে গেলেও নিজের জন্মদিনটা সবাই সঙ্গে নিয়েই যায়। দেশে বা দেশের বাইরে যেখানেই থাকুক, বছরের নির্দিষ্ট দিনে জন্মদিন ঠিকই ফিরে আসবে, দিনের শুরুতেই ফুলের তোড়া হাতে ঘরের দুয়ারে কেউ এসে বলবে– শুভ জন্মদিন। কেউবা ইংরেজিতে বলবে, 'হ্যাপি বার্থ ডে।'

বছরে বছরে এমনই তো হয় তোমাদের ঘরে ঘরে। মা-বাবা ভাই-বোনসহ আত্মীয়স্বজনের কত আনন্দ এই দিনে! রঙিন কাগজে, রংবেরঙের ফুলে, বেলুনে, মোমবাতিতে কী যে বর্ণিল উৎসব! কিন্তু সে অনুষ্ঠান তো শুধু তোমাদের নিজেদের বাড়িতেই হয়, বাড়ির বাইরে বিশেষ খবরই রাখে না কেউ। অথচ সত্যিকারের বড়ো মানুষের জন্মদিন কিন্তু অন্যভাবে পালিত হয়। সত্যিকারের বড়ো মানুষ নিজের কর্মকাণ্ড দিয়ে অন্যদের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যেরা তাঁকে সম্মান করে, তাঁর মতো বড়ো হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। তাঁরাই জাতিকে পথ দেখান, বুদ্ধি দেন, নেতৃত্ব দেন। এই সব বড়ো মানুষের জন্মদিন তো কেবল তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পালিত হয় না, পালিত হয় অনেক বড়ো পরিসরে, সারা দেশ জুড়ে।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথাই ধরা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই জানো তাঁর জন্মদিন ১৭ই মার্চ (১৯২০), জন্মস্থান- টুঙ্গিপাড়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন গোটা জাতি পালন করে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে। শিশুদের তিনি গভীর ভালোবাসতেন, প্রতিটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ চাইতেন। তাঁর জন্মদিনে শিশু দিবস পালনের মধ্য দিয়ে জাতি স্বপ্ন দেখে এইসব শিশুর মধ্যেই হয়ত জন্ম নেবে অনাগত কালের লক্ষ মুজিব।

এই অসামান্য বড়ো মানুষের ঘরে জন্ম নেওয়া অন্য এক বড়ো মানুষ আমাদের জননেত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো তিনিও জন্মগ্রহণ করেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে, ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৭)। পিতার প্রথম সন্তান তিনি। মধুমতি- বাইগার নদী বিধৌত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার ধুলোমাটি আর কাদাজলেই কেটেছে তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্বপ্ন রঙিন দিনগুলো। মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসার সরল পাঠ তিনি পেয়েছেন পিতা-মাতার স্নেহ-সান্নিধ্য থেকেই। দেশের মানুষের প্রতি প্রবল মমত্ববোধই তাঁকে ধীরে ধীরে রাজনীতিমনস্ক করে তোলে। ঘাতকের গুলিতে পিতা-মাতা, ভাই-ভাবি ও স্বজনদের হারানোর পর জীবনের বহু কঠিন পথ পেরিয়ে অধিকারহারা জনতার কাতারে এসে গড়ে তোলেন দুর্বার গণ-আন্দোলন। জনতার লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে ওঠেন জননেত্রী। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে গণমানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়ে বার বার তিনি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলার দুখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেসব কর্মসূচি নিয়েছিলেন, সরকার গঠনের পর সেই অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেন। বর্তমানে তারই সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। গৃহহীন মানুষ পাচ্ছে আশ্রয়। সব মানুষকে মানবিক মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। আজ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে ঘটছে অভাবনীয় উন্নতি।

জনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েই শেখ হাসিনা হয়েছেন জননেত্রী। তাঁর জন্মদিন কি শুধু জন্মগ্রাম টুঙ্গিপাড়াতেই পালিত হবে? তা কী করে হয়! গ্রাম প্রধান এই বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে সমান। স্বজন হারানোর শোক বুকে নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে লড়াইয়ে নেমে প্রতিটি গ্রামেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আপনজন। সেই আপনজনেরা তাঁর জন্মের এই শুভদিনে প্রাণ খুলে বলবে শুভ জন্মদিন প্রিয় নেত্রী, শুভ জন্মদিন!

ছোট্টো বন্ধুরা, তোমরা কি জানো আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বড়ো মাপের লেখকও। একটা- দুটো নয়, অনেকগুলো বই লিখেছেন তিনি। এ দেশের মানুষের জীবনের লড়াই সংগ্রাম নিয়ে লিখেছেন। আবার নিজের স্মৃতি থেকেও শৈশব-কৈশোরের অনেক কথা লিখেছেন দরদ দিয়ে। বড়ো হয়ে তোমরা নিশ্চয় পড়বে সেসব বই। নিজের জন্মদিন সম্পর্কে কী চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর লেখা বইতে! সেখান থেকে একটুখানি তুলে দিই তোমাদের জন্য, তোমরা পড়ে দেখো। বাল্য স্মৃতিনির্ভর এক আবেগঘন রচনা 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' এ তিনি লিখেছেন,

> 'আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। ...আমার শৈশবের স্বপ্নরঙিন দিনগুলো কেটেছে গ্রামবাংলার নরম পলিমাটিতে, বর্ষায় কাদাপানিতে, শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে, ঘাসফুল আর পাতায় পাতায় শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে, জোনাকজ্বলা অন্ধকারে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে, তালতমালের ঝোপে বৈঁচি, দিঘির শাপলা আর শিউলি বকুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে, ধুলোমাটি মেখে, বর্ষায় ভিজে খেলা করে।'

এই বর্ণনা থেকে বাংলাদেশের প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া যায়, গ্রাম্যজীবনের গভীরতা ও নিবিড়তার স্পর্শ পাওয়া যায়। আজকের জননেত্রী শেখ হাসিনা যে বাংলা ও বাঙালি জীবনের কত গহিন ভেতর থেকে উঠে এসেছেন এবং সারা জীবন কত গভীরভাবে পল্লি প্রকৃতির সারল্য লালন করেন বুকে, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই রচনায়। আপন দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব থাকলে তবেই এমন নিপুণ বর্ণনায় তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

কেমন ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনার শিশুবেলা কিংবা কিশোরবেলা? জানতে ইচ্ছে করে না তোমাদের-- এত বড়ো মাপের মানুষটি কেমন করে কাটিয়েছেন তাঁর ছোটোবেলা? এসো তাঁর নিজের লেখা থেকেই সে বিবরণ কিছুটা জেনে নিই তিনি লিখেছেন,

> 'খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে ট্যাংরা পুঁটি বল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে

অনেক কচুরিপানা ভেসে আসতো। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসতো কই আর বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম'।

এই হচ্ছেন শেখ হাসিনা। শেখ মুজিবের কন্যা। পিতাও যেমন সারা জীবনে তাঁর গ্রামের স্মৃতি ভুলতে পারেননি, কন্যাও হয়েছেন তেমনি। 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' খুললে কি মানুষ এতটাই অকপট হতে পারে, এমন করে মেলে ধরতে পারে ফেলে আসা শিশুবেলার কথা! 'শেখ মুজিব আমার পিতা' নামের বইতেও তিনি গ্রাম্যজীবনের বাল্যস্মৃতির কথা লিখেছেন কী যে সহজ সরল ভাষায়, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সেখানে তুলে ধরেছেন তাঁর শৈশব কৈশোরের চঞ্চলতা এবং দুষ্টুমিভরা নানান কাজের সহজ বর্ণনা। কেমন অবলীলায় তিনি লেখেন,

> 'বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষেবাটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে,তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আমমাখা পুরে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এই আমমাখা পুরে যে না খেয়েছে সে কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আমমাখা পুরলে তার ঘ্রাণই হতো অন্যরকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারামারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড়ো তালাপের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বরই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরই পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়তো এবং কারো পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না তখন সেই বরইটার জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনো ভুলতে পারলাম কই!"

বড়ো হয়ে ওঠার অনেক পরে সাহিত্যের ছাত্রী শেখ হাসিনা এক লেখায় জানিয়েছেন, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' তাঁর অতি প্রিয় বই। গ্রামে অতিবাহিত শৈশবের কথা বলতে গিয়ে তিনি অপু-দুর্গাদের দলেই নিজেকে দেখতে পান কি না কে জানে! মধুমতি নদী, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, খেজুর কিংবা তাল-নারকেল গাছ, চড়ুই পাখি, শালিক, অলস কণ্ঠে দুপুরে ডাকা ঘুঘুর ডাক কিছুই বাদ যায় না তাঁর বর্ণনা থেকে। শৈশবের স্মৃতিময় নদী আর প্রকৃতির যে নিপুণ বিবরণ তুলে ধরেন তার কোনো তুলনাই হয় না। এ ধরনের রচনা পাঠ করলে সহজেই বুঝা যায়, আজকের শেখ হাসিনা ওই মাটি, জল, হাওয়া ও উদার আকাশের নীলিমা থেকে এসেছেন। দেশের জনগণকে ভালোবেসে, সুখে-দুখে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন জননেত্রী। শুধু টুঙ্গিপাড়া নয়, তাঁর জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে পরিব্যাপ্ত তাঁর জন্মস্থান। তাঁর জন্মদিনে সারা বাংলাদেশ একযোগে 'হ্যাপি বার্থ ডে' জানাবে, আমরা সবাই মিলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করব–' দীর্ঘজীবী হন প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, শুভ জন্মদিন।'■

কথাসাহিত্যিক ও শিশুসাহিত্যিক

গল্প

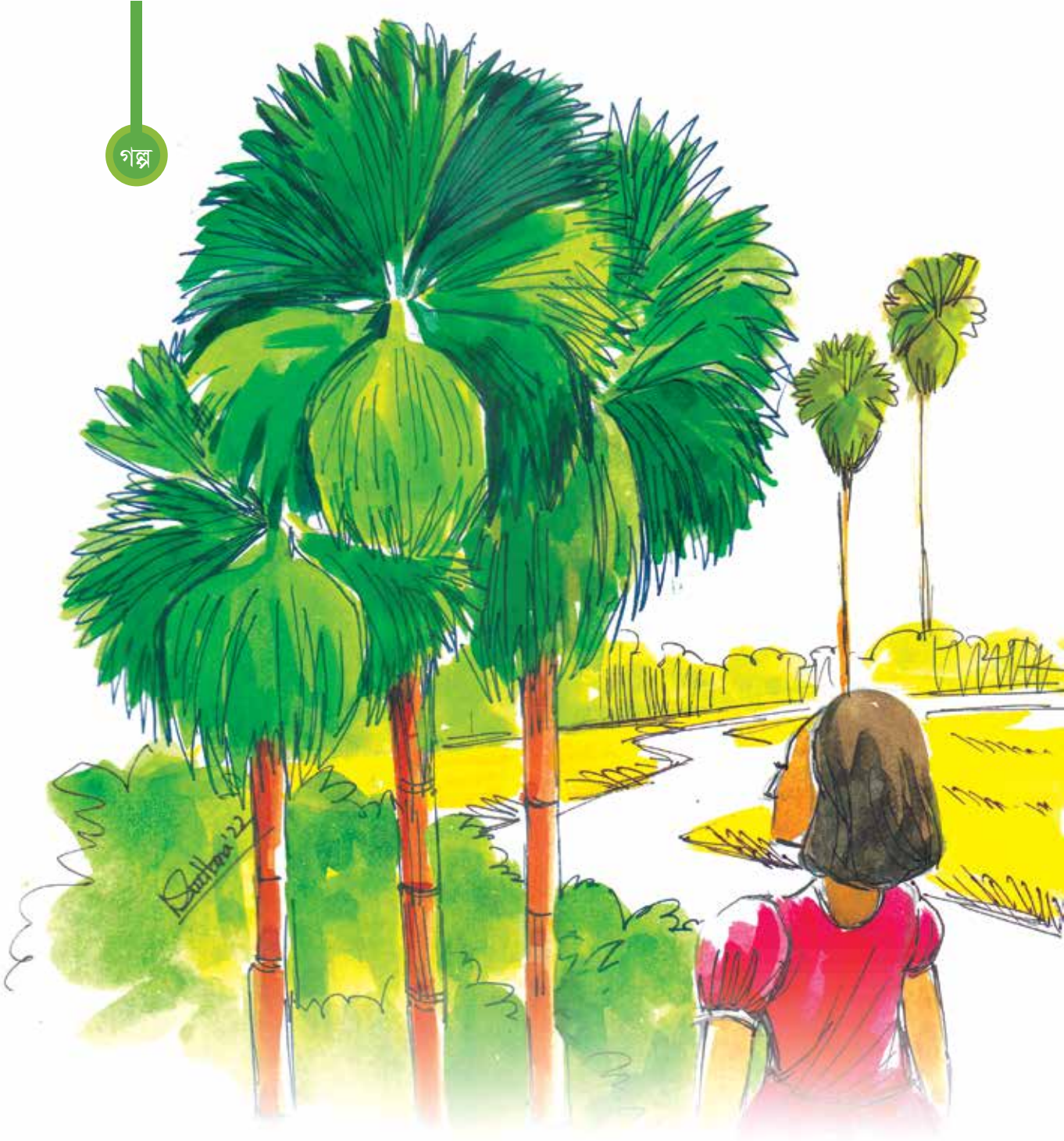

তালের পিঠা

প্রজীৎ ঘোষ

এখন ভাদ্র মাস। বাংলার প্রকৃতিতে শরৎকালের শারদীয় হাওয়া বইছে। কৃষকেরা পাট কেটে জলে জাগ দিয়ে তা পচে গেলে ধুয়ে সোনালি আঁশ রোদে শুকাচ্ছে। আউশ ধানে কৃষকের গোলা প্রায় ভর ভর। মাঠে এখনও জল থই থই করছে। বিলে-ঝিলের জলে

সাদা শাপলা ফুটে আছে। এ দৃশ্য দেখতে কার না ভালো লাগে? সবারই মন জুড়িয়ে যায় বাংলার এই মনোরম পরিবেশে।

বাংলার প্রতিটি ঋতুই মিতার খুব পছন্দ। সে বছরের ছয়টি ঋতুই খুব উপভোগ করে। তাছাড়া ভাদ্র মাস এলেই মিতার রাতে ভালো ঘুম হয় না। কেননা, ভাদ্র মাসে তাল পাকে। আর তাল কুড়ানোর চিন্তাটি সবসময় ওর মনে বাসা বাঁধে। এ সময় পাকা তাল কুড়ানোর একটা আলাদা মজা আছে। তাছাড়া তালের পিঠা খেতে ওর অমৃতের সমান মনে হয়। ওর বাবা বলে-ভাদ্র মাস এল আর মিতার চোখের ঘুম চলে গেল। ওর মা বলে একটা পাকা 'তাল কুড়ানির মা'। ওর মা একটু জেদি প্রকৃতির লোক । তাই এসব তার একেবারে পছন্দ হয় না। যদি তবে মেয়ে তাল কুড়িয়ে আনে তবে সে কত খুশি হয় তার হিসেব নাই। তাই মিতার মাঝে মাঝে খুব ভয় হয় । আবার মাঝে মাঝে খুব সাহস হয়।

ওদের বাড়ির থেকে সামান্য দূরে তাল বাগান। গ্রাম্য ভাষায় সে স্থানকে পালান বলা হয়। সেই তাল বাগানে পাঁচ-ছয়টি তালগাছ মাথা উঁচু করে তাল কাঁধে নিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তালগাছের নিচে ভাটি বাগান। বেশ জঙ্গল প্রকৃতির স্থান। কিন্তু তালগাছের গোড়া একেবারে পরিষ্কার। আর সেখানেই তাল পড়ে কালো হয়ে থাকে।

মিতার এবার মনে খুব কষ্ট। কেননা, এ বছর সে তালতলাতে গিয়ে একটি তালও কুড়াতে পারেনি। মিতা প্রায়ই ভোরবেলা উঠে তালতলায় যায় কিন্তু একটিও তাল পায় না। সেদিন ভোরবেলায় তাল গাছের নিচে যেতে না যেতেই সে দেখতে পায় একটা শেয়াল কয়েকটা তাল নিয়ে দৌড় দিচ্ছে। তালগাছের নিচেও কয়েকটি তালের আঁটি পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মিতা মনে মনে বলে ইস্ আর যদি ১০ মিনিট আগে আসতাম! তাহলে তালগুলো আমার হয়ে যেত। মাথায় থাপ্পড় দিয়ে বলে- আমার ভাগ্যটাই এ বছর ভালো না।

এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। এখন ভরা ভাদ্র মাস। অথচ হলে কী হবে? মিতা এবার একটাও তাল কুড়াতে পারছে না। হয়ত কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নয়তো শেয়াল-কুকুরে টেনেহেঁচড়ে খাচ্ছে। তাই মিতার মনটা খুব খারাপ। মন খারাপ থাকলে ওর পড়তেও ভালো লাগে না। তাই পড়ার জন্য মায়ের কাছে প্রায়ই বকা শুনতে হয় দুই কান ভরে। মিতা গত বছরও প্রচুর তাল কুড়িয়েছিল। ও তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তো এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভালো। গতবার পঞ্চম শ্রেণিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হওয়ায় বৃত্তি পায়নি। তাই একটা ছোট্ট দুঃখ মনের মাঝে দাগ কেটে আছে। তা থাকলেও মিতা তাল কুড়ানোতে খুব পটু। গতবার সে একাই অনেক তাল কুড়িয়েছিল। তাই সবাই তাকে 'তাল কুড়ানির মা' নাম দিয়েছিল। 'তাল কুড়ানির মা' বললেই ওর খুব রাগ হতো। তবুও লোকজন খেলাচ্ছলে ওকে রাগিয়ে তুলতো। একবার মিতু ওকে তাল কুড়ানির মা বলাতে মিতা রেগে গিয়ে বলেছিল- 'ফের যদি আরেকবার তাল কুড়ানির মা বলেছিস তো অনেক বকা দোবা কিন্তু অথচ, এ বছর তাকে কেউ এ কথা বলেনি। তখন 'তাল কুড়ানির মা' শুনতে খারাপ লাগলেও এ বছর না শুনে তার থেকে দ্বিগুণ কষ্ট হচ্ছে ওর।

আজ পড়ার টেবিলে বসে মিতা ভাবতে থাকে এ বছর কি একটি তালও আমার ভাগ্যে নেই? 'তাল কুড়ানির মা' নামটি কি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে মানুষের মুখ থেকে?

আজ সকালে ওর বাবা তো খেতে বলেই ফেলেছিল- তাল কুড়ানির মায়ের এবার কী হলো? এবার যে একটাও তালের পিঠা খেতে পারলাম না। তাহলে কি তাল কিনে খেতে হবে নাকি? এত্ত বড়ো বড়ো গাছ থাকতে যদি তাল কিনে খেতে হয়, তাহলে তো তালগাছ বিক্রি করে দিলেই ভালো হয়। মিতা বলল- না বাবা! আজ তাল কুড়িয়ে আনব। ওর মা বলল- না! যাবার দরকার নেই। ওর বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে- তুমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসো। আমি তাই দিয়ে তালের পিঠা তৈরি করে দেবো। আর তালগাছ বিক্রি করে দাও। আমরা একটাও খেতে পারি না। তাহলে তালগাছ রেখে কী হবে? মায়ের কথায় মিতা একেবারে বাতাসহীন বেলুনের মতো চুপসে গেল। ও মনে মনে ভাবতে থাকে আজ তাকে তাল কুড়াতেই হবে।

যাই হোক মিতা বাবাকে কথা দিয়েছে আজ সে তাল কুড়িয়ে আনবেই আনবে। কিন্তু কীভাবে? কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না মিতা । ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ও মনে মনে জিদ করে আজ যদি তাল কুড়াতে না পারে তাহলে কোনোদিনও তাল কুড়াতে যাবে না। এমনকি একটা তাল ছুঁয়েও দেখবে না কোনোদিন।

এমন এক জিদ নিয়ে গুটিগুটি পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে তালতলাতে যায় মিতা। এই বিকেল বেলায়ও তালগাছের নিচে কোনো তাল নেই। শুধু শেয়ালে এড়ানো কয়েকটা আঁটি পড়ে আছে মিতার জন্য। মিতা এই দৃশ্য দেখে কেঁদে ওঠে। এবার বুঝি সত্যি সত্যিই তাল কুড়িয়ে বাবাকে তালের পিঠা খাওয়ানো হবে না ওর। এই কথা ভাবতে ভাবতে ওর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে জামাকাপড় ভিজে যায়। তারপর নির্দয় তালগাছের দিকে তাকিয়ে পাশের একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে তালগাছটার কাঁচা ও শুকনো পাতায় দোলা দেয়। অমনি ঝুপ করে এক কাঁদি তাল ভাটি গাছের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। মিতা চোখ মুছে দৌড়ে গিয়ে সব তাল কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। মিতার তাল কুড়ানোর ঘটনাটা সবাই জানতে পেড়ে অনেকেই ওদের বাড়িতে এসে ভিড় করে। ওর এতগুলো তাল একসাথে কুড়াতে দেখে সবাই বলাবলি করে– মিতা আসলেই একটা তাল কুড়ানির মা। তা না হলে এত তাল একবারে পায় কার সাধ্য আছে? মিতা আজ তাল কুড়ানির মা বলায় কাউকে কিছু না বলে বরং ঠোঁট বাঁকা করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

সন্ধ্যায় ওর বাবা বাজার থেকে দুধ ও মিঠাই নিয়ে আসে। রাতে ওর মা কিছু তাল তালকুড়ানিতে সেঁকে সেঁকে দুধ মিশিয়ে রান্না করে। আর বাকি তালের ভেতর কিছু চালের গুঁড়া মিশিয়ে ছোটো ছোটো গোলা বানিয়ে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দেয়। চামচ দিয়ে কড়াইতে নাড়াচাড়া দিতেই দুই মিনিট পর তালের পিঠা হয়ে ফিরে আসে খাবার পাত্রে। পিঠা বানানো শেষে মিতা এবং ওর বাবা-মা একসাথে বসে মজা করে তালের পিঠা খায়। ■

গল্পকার

বাতুলের বিড়াল

আশরাফ পিন্টু

বাতুল সারাক্ষণ বিড়াল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাবা– মা বকেন, পড়াশোনা তো গোল্লায় যাচ্ছে, পাস করবি কী করে?

বাতুল বাবা-মায়ের কথা তেমন গায়ে মাখে না। ও জানে, বাবা-মাও বিড়ালটিকে বেশ ভালোবাসেন। বাবা বাজার থেকে বিড়ালের জন্য মাছ ছাড়াও কেক, বিস্কুট নিয়ে আসেন। মা সেগুলো ওর খাবারের জন্য ছোটো ছোটো করে প্লেটে সাজিয়ে রাখেন।

বাতুল বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। ক্লাস থ্রিতে পড়ে। পড়াশোনায়ও বেশ ভালো। অল্প পড়ে গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। তাই খুশি হয়ে বাবা-মা ওকে এই বিদেশি বিড়ালটি কিনে দিয়েছে। বাতুল নিজে পড়ার পর বিড়ালটিকে পড়াতে বসায়।

রবীন্দ্রনাথের সেই 'মাস্টারবাবু' কবিতার মতো–

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই,
যত আমি বলি 'শোন্, শোন্'।
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ'
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ, মিয়োঁ'।

রবীন্দ্রনাথের কানাই মাস্টারের মতো বাতুল তার বিড়ালটিকে অনেক চেষ্টা করেও 'মিয়োঁ মিয়োঁ'-এর বেশি কিছু শেখাতে পারেনি। তবে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। সে বাবা-মাকে বলে, দেখো আব্বু-আম্মু, ওকে একদিন আমি সব বাংলা বর্ণমালা শেখাবোই। বাবা-মা মৃদু হেসে ওর কাছে থেকে সরে পড়েন।

বাতুল একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বিড়ালটি নেই। অনেক ডাকাডাকি করেও বিড়ালটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ও কান্না শুরু করে দেয়। বাবা-মা বোঝাতে থাকেন, হয়ত পাশের বাড়ির কোথাও বেড়াতে গেছে। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে যায় বিড়ালটি বাড়ি ফেরে না। বাতুলের শোক কাটে না। পড়াশোনায়ও মন বসে না।

হঠাৎ একদিন বিকেলে বাতুল ঘুম ভেঙে দেখে কোলের কাছে বিড়ালটি ঘুমুচ্ছে। তখন বাতুলের আনন্দ দেখে কে! ওকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে চুমু খায়।

পরদিন থেকে ওকে নিয়ে আবার আগের মতো রুটিন শুরু হয়ে যায়। সারাদিন বিড়াল নিয়ে সময় কাটিয়ে নিজের পড়া শেষ করে বিড়ালকে পড়াতে বসে।

বাতুল বলে, বলো– চ ছ জ ঝ ঞ।

বাতুলকে অবাক করে দিয়ে বিড়ালটি বলে ওঠে, চ ছ জ ঝ ঞ।

বাতুল বিড়ালের মুখে পড়া শুনে আনন্দে নেচে ওঠে। বিড়ালটিকে কোলে তুলে এক দৌড়ে বাবা-মায়ের কাছে চলে যায়। বলে, দেখো আব্বু- আম্মু, আমার বিল্লিসোনা পড়া শিখেছে। বাবা-মাকে শোনানোর জন্য ও আবার বলে, বলো- চ ছ জ ঝ ঞ।

বিড়াল বলে, চ ছ জ ঝ ঞ।

কিন্তু বিড়ালের মুখে মানুষের মতো পড়া শুনে বাবা-মা তেমন অবাক হন না। কারণ বাবা যখন বিড়ালটি কেনেন তখন দোকানদার বলেছিল, এটি একটি রেয়ার বিড়াল। ওর মস্তিষ্কে কিছুটা মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যে-কোনো সময় মানুষের মতো কথা বলে উঠবে। ■

গল্পকার

চিড়িয়াখানা

ওমর ফারুক নাজমুল

চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা
পশুপাখির রং বাহানা
বাঘের কাছে যেতে মানা
বাঘ যদি দেয় হঠাৎ থাবা
উরিব্বাবা ! উরিব্বাবা !

কী অপরূপ কী অপরূপ !
জলহস্তী দেয় জলে ডুব
ঘুরতে মজা চমৎকার খুব
হরিণ গাধা একই খাঁচায়
শুধু শুধু বানর লাফায়।

উরিব্বাবা! উরিব্বাবা!
তোমরা দেখতে কে কে যাবা।
ললিপপ আর বাদাম খাবা।

চিড়িয়াখানায় আর কী আছে?
পেখম খুলে ময়ূর নাচে
বক পাখিদের দেখবে কাছে।

কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য নয়

লাভলী আক্তার

দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়েসি শিশু। এই শিশুদের অন্তত ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু। কন্যাশিশুকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না।২০০৩ সালে কন্যাশিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩০শে সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এই দিবসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ হলো শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায় বিচারের অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন। কন্যার পরিপুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এই দিবসের মূল লক্ষ্য।

২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম এ দিবসটি পালন করা হয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করে থাকে। তবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দিনে দিবসটি পালন করে থাকে।

আদিকাল থেকেই পরিবার ও সমাজে কন্যাশিশুরা অবহেলিত। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার যুগযুগ ধরে প্রভাব বিস্তার করছে। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক প্রতিটি সন্তানেরই বেড়ে উঠার অধিকার রয়েছে। আমাদের দেশে ছেলে শিশু জন্মগ্রহণের পর অনেক পরিবারেই আনন্দের সীমা থাকে না। পক্ষান্তরে কন্যাশিশুর জন্মগ্রহণকে। টেনশনের বার্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কন্যাশিশুর প্রতি অবহেলাই অনেক সময় তাদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়। কন্যাশিশুরা আমাদের দেশে নিজ পরিবারেই বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার অনেক কন্যাশিশুর কপালে জোটে না। ফলে তারা অল্প বয়সে নানা রকম রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অজ্ঞতাবশত জড়িয়ে পড়ে নানারকম অসামাজিক কার্যকলাপে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাল্য বিয়েতে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা এগিয়ে। বাংলাদেশে ১৮ বছরের আগে বাল্যবিবাহের হার ৪৯ শতাংশ। পারিবারিক ও সামাজিক কারণে আইন এবং শত প্রচার করেও বাল্যবিয়ে বন্ধ করা যাচ্ছে না। ইউনিসেফের তথ্য মতে বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় ৫২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় এবং অধিকাংশ মেয়ে শিশুই অল্প বয়সে গর্ভধারণ করে।

শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ণসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সব শিশুকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণয়ণ করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা-২০১০। এটি শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর ৮ অনুচ্ছেদে রয়েছে কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও সকল ধরনের বৈষম্য দূর করতে হবে। নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর ১৮.১ অনুচ্ছেদে রয়েছে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অনুযায়ী শিশু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহের মতো সকল ধরনের প্রথার অবসান করতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বাজেটের ২ শতাংশ শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখেন যা কন্যা ও পুত্র সকল শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।

কন্যাশিশুদের জীবনের শুরু ভালো হলে পরিবার দেশ ও বিশ্ব সবচেয়ে উপকৃত হবে। দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্যমোচনের সবচেয়ে কার্যকর উপায় শিশুদের জন্য বিনিয়োগ। সরকার সকল প্রকার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কন্যাশিশুর অন্তর্ভুক্তি করার ওপর জোর দিচ্ছে। অধিক পরিমাণে নারী শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে। কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি করা হয়েছে। খেলাধুলা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একদশক আগে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার ছিল ৬১ শতাংশ যা বর্তমানে ৯৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত যথাক্রমে ৫০.৭৫ ও ৫৩.৯৯ শতাংশ। কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা(১) এর অধীন ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড' শাস্তির পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে।

আমাদের কন্যাশিশুরা আমাদের দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা আমাদের কন্যা-জায়া-জননী। তাদের নিরাপদে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের সমঅধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণসহ তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের কন্যাশিশুরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি, মনসম্মত শিক্ষা ও নিরাপত্তার দাবিদার। তারা উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী নারী হিসেবে বেড়ে উঠতে পারলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য না করে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আজকের কন্যাশিশু কালকের মা। আর একটি শিক্ষিত মা–ই পারে শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে। ■

প্রাবন্ধিক

হাসির রাজার দুঃখ-কষ্ট

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

চার্লি চ্যাপলিন এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই ছবি, যার পরনে ঢলঢলে প্যান্ট, আঁটোসাঁটো কোট, দু'পায়ে ইয়া বড়ো জুতো, মাথায় হ্যাট, হাতে একটি ছড়ি।

খুব সহজ স্বাভাবিক অভিনয় করতেন মানুষটি। তার চলনেবলনে কী যে এক জাদু ছিল, দর্শকদের মাঝে হাসির ফোয়ারা বয়ে যেত। স্বাভাবিক অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মাতোয়ারা করে দিতেন, তাই তো কৌতুক অভিনেতা চার্লিকে বলা হয় *হাসির রাজা*।

১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল দক্ষিণ লন্ডনের ওয়ালওয়ার্থের বার্লো স্ট্রিটে চার্লির জন্ম, বাড়িতে মানুষ মাত্র

তিনজন। খুব ছোটো পরিবার । বড়ো ভাই সিডনি, চার্লি ও তার মা কেনিংটন রোডের একটি বাড়িতে বাস করতেন।

চার্লি যখন ছোট্ট ছেলে তখন তার মায়ের রোজগার বেশ ভালোই ছিল। নিয়মিত অভিনয় করতেন মা। কাজ সেরে বাড়িতে ফিরার সময় দু'ছেলের জন্য নিয়ে আসতেন নানারকম খাবার। খুব শৌখিন ছিলেন তিনি, ফুল কিনে এনে ঘর সাজাতেন, টেবিলে গুছিয়ে রাখতেন কেক ও নানা ধরনের খাবার। গোছানো স্বভাব ছিল চার্লির মায়ের। তাই কেনিংটনের খুপরি ঘরটি বড়ো ভালো লাগত চার্লির।

এই বাড়িতে থেকে থেকে মাঝে মাঝে চার্লির মন খারাপ হয়ে যেত। তাই তিনি ছুটে যেতেন ট্যাঙ্কার্ড রোডের সামনের খোলা হাওয়ায়। সেখানে অপলক তাকিয়ে দেখতেন অভিনেতা–অভিনেত্রীদের, এ যেন অন্য এক হাসিখুশির জগৎ। জুরি গাড়ি থেকে ওরা নামতেন। পরনে থাকত ঘোড়সওয়ারের মতো আঁটোসাঁটো পোশাক। ওদের হাঁটার ধরনও ছিল চমৎকার। গটগট করে ছন্দ তুলে হাঁটতেন ওরা। কী যে জৌলুস! কী যে ঠাটবাট তাদের! পরনে দামি স্যুট, মাথায় পশমের টুপি, আঙুলে হীরের আংটির ঝলক। চার্লি অবাক চোখে তাকিয়ে ওদেরকে দেখতে দেখতে বুদ হয়ে যেতেন।

এক সময় ওরা চলে গেলে ফাঁকা হয়ে যেত গমগমে রাস্তাটি। তবুও তিনি ঘরে ফিরতেন না। নিঝুম পথে দাঁড়িয়ে চার্লির মনে হতো, সূর্য যেন মেঘের আড়ালে চলে গেছে। তাই তো ঝলমলে রাস্তাটির আলো বড্ড ফিকে মনে হতো।

খুব মন খারাপ হয়ে যেত চার্লির। এখন আবার ফিরে যেতে হবে দমচাপা বিষণ্ন ঘরে। ঘরটি যে বড্ড ছোটো, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বারো ফুটের একটু বেশি। নিচু ছাদ, দেয়াল ঘেঁষে রাখা টেবিলে অপরিচ্ছন্ন প্লেট ও চায়ের পেয়ালা।

নীরব ঘরটিতে দাঁড়িয়ে চার্লির কান্না পেতে থাকে। বড়ো ভাই সিডনি সমুদ্রে গেছে। রোজগারের জন্য কাজ নিয়েছে সে জাহাজে। বুকের ভেতরটা হু হু করতে থাকে ওর। ও একেবারেই একা।

অথচ কিছুদিন আগেও রোববারের সকালগুলো ছিল ভারি সুন্দর। মায়ের মুখটি ছিল মধুর হাসিতে মাখা। তার নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ছোট্ট ঘরখানি ঝলমল করত ।

মায়ের বয়স কতইবা ছিল তখন, মাত্র সাঁইত্রিশ। সব মায়েদের মতো ওদের মা'ও ডেকে ডেকে ঘুম থেকে জাগাতেন, গেট আপ গেট আপ মাই সুইট বয়।' চোখ মেলে বালক চার্লি দেখত সাজানো গোছানো ঘর। চুল্লিতে তখনও অল্প অল্প আগুন জ্বলছে। উনুনের ওপর কেটলি বসানো। কাঠের উনুনে মা কিছু একটা সেকছেন। মুচমুচে টোস্টে একমনে মাখন মাখাচ্ছেন দু'ছেলের জন্য।

খুব শান্তি ও সুখের ছিল চার্লির শৈশব। মা টুকিটাকি কাজে ডুবে আছেন, কেটলি থেকে ভেসে আসত গরম জলের শোঁ শোঁ আওয়াজ। ছোট্ট চার্লি তখন আয়েশি ভঙ্গিতে শুয়ে কমিক বইয়ের পাতা উলটাতো।

এমন সুখের দিন হঠাৎ করেই ফুরিয়ে গেল। আর্থিক কষ্টের ভাবনা মা-কে তখন একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এদিকে বড়ো ভাই সিডনির কোনো খোঁজ নেই। বাড়িভাড়ার টাকা সময়মতো দিতে না পারায় মালিক এসে সেলাইয়ের মেশিনটি নিয়ে গেছে।

মায়ের বেশিরভাগ আয় হতো সেলাই মেশিন থেকে। বাড়ির মালিক এটি নিয়ে যাবার পর চরম বিপদ ঘনিয়ে এল। দু'তিন বেলার খাবার কীভাবে জুটবে-এ ভেবে মায়ের শরীর ভেঙে যেতে থাকে। জীবনযুদ্ধে এইটুকুন ছেলে চার্লিও তখন নেমে গেছেন। নিজে একজনকে নাচ শিখিয়ে আয় করতেন পাঁচ শিলিং। এই দিয়ে কোনোরকমে টানাটানির সংসার চলে যেত। এখন তাও বন্ধ।

এবার কী হবে? কী করে চলবে মা আর ছেলের সংসার? চার্লি বলেছেন– কষ্টের মধ্যে থাকাই আমাদের অভ্যেস।

চার্লির রোজকার রুটিন একই রকম। স্কুলে যাওয়া, বাড়িতে ফিরে আসা, সাংসারিক কিছু কাজকর্ম করা, এরপর মায়ের পুরনো বান্ধবী ম্যাকার্থির বাড়িতে যাওয়া। সেখানে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে

আসা। সেই সময়টা খুব ভালো কাটত চার্লির। ম্যাকার্থির বাড়িতে ওদের অভাব-অনটন ছিল না, ছিল আনন্দ।

মায়ের বান্ধবী ম্যাকার্থির ছেলের নাম ওয়ালি, ওর সাথে অনেকটা সময় খেলে, গল্প করে হাসি–আনন্দে চার্লির সময়টা কেটে যেত, রোজই কিছু খাবার ও চা দিত ওরা। সেগুলো খেয়ে ও ঘরে ফিরে আসত।

চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন

চার্লির কিন্তু নিজের বাড়িতে মায়ের পাশে থাকতেই ভালো লাগত। মা যখন ছেলের জন্য যত্ন করে খাবার পরিবেশন করতেন, তখন ওর ছোট্ট বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে যেত।

মা নিপুণ হাতে পরিপাটি করে রুটি সেকে দেন। কোনোদিন এর সাথে থাকে দু'এক টুকরো মাংস। মায়ের অনেক গুণ ছিল। অভিনয় তো জানতেনই আবার চমৎকার উচ্চারণে বই পড়ে ছেলেকে শোনাতেন। চার্লিও খুব মন দিয়ে শুনত। মনে মনে ভাবত ,মা তো ভালো পড়বেনই, কারণ তিনি যে অভিনয় করতে জানেন। কিন্তু এগুলো তো অনেক আগের কথা। মাঝে মাঝে ভাবত মাকে একা ফেলে ওয়ানীদের বাড়িতে বিকেলে আর যাব না। আমি মায়ের কাছেই থাকব।

একদিন যখন চার্লি বাড়িতে বসে রইলেন মায়ের পাশে, মা কিন্তু মোটেও খুশি হলেন না। বরং গম্ভীর গলায় বললেন, ম্যাকার্থির বাড়ি যাবি না? যা, ওয়ালির সাথে খেলা করে আয়।

চার্লি কিন্তু যেতে মোটেও রাজি নয়। ছোট্ট এই বিষণ্ন ঘরে মাকে একা ফেলে সেই আনন্দময় বাড়িতে যেতে মন চাইছে না। চার্লি বলল, আজ আমি ওদের বাড়িতে যাব না, আমি তোমার কাছে থাকব মা। রুখুসুকু গলায় ধমক দেন মা। যা– তাড়াতাড়ি ওদের বাড়িতে যা। তোকে কী খেতে দেবো আমি? বাড়িতে যে কিছুই নেই। ওয়ালিদের বাড়িতে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে আয় বাবা।

হ্যাঁ, মায়ের আদেশ অমান্য করেনি চার্লি। মলিন ঘরে একাকী মাকে রেখে ওয়ালিদের বাড়িতে রাতের খাবার খেতে গেল বালক চার্লি।

একটানা অভাব আর দুশ্চিন্তার মাঝে থাকতে থাকতে মায়ের মাথায় গোলমাল দেখা দিলো একসময়। মাকে তো এখন আর বাড়িতে রাখা যায় না, চিকিৎসার জন্য তাকে রেখে আসা হলো ক্যানহিলে। চার্লি বাড়িতে একা। সারাক্ষণ মায়ের জন্য প্রার্থনা করেন, হে প্রভু–মাকে সুস্থ করে দাও।

একদিন সিডনি ফিরে এল বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে বেশ কিছু টাকাকড়ি। চার্লির খুশির সীমা নেই, নতুন জুতা কেনা হলো ওর জন্য। এত সুখের মাঝেও মায়ের জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে দু'ভাইয়ের। যে ছেলের খবরাখবর না পেয়ে মা সারাক্ষণ ভাবতেন সেই ছেলে ফিরে এসেছে। হাত ভর্তি ওর প্রচুর পাউন্ড। এই আনন্দের দিনে শুধু মা নেই।

সিডনি বেদনামাখা স্বরে বলে, আজকের দিনে মা যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, কী যে ভালো লাগত আমাদের।

ক্যানহিলে মাকে দেখতে গেলেন দু'ভাই। তিনি আগের মতো নেই। মা অনেক রোগা হয়ে গেছেন। আদরের ছেলেদের তিনি চিনতে পারলেন, তবে

আগের মতো প্রাণবন্ত আর উচ্ছল হয়ে উঠলেন না। পুরনো সব স্মৃতি হয়ত মন থেকে মুছে গেছে।

সিডনি অভ্যেসমতো অনেক কথা বলতে থাকে, কিন্তু মা একেবারেই চুপ। আগের মতো তার আনন্দ–উচ্ছ্বাস নেই। ছেলেদেরকে প্রশ্ন করে সব জেনে নিতে মায়ের আগের সেই আগ্রহ আর নেই। অসুখ তাকে এমনই ভাবনাহীন করে তুলেছে।

চার্লি মিষ্টি করে বলেন, মা তুমি ভালো হয়ে যাবে। মা স্নেহমাখা সুরে জবাব দেয়, আমি অনেক আগেই ভালো হয়ে যেতাম রে চার্লি। সেই বিকেলবেলা তুমি যদি আমাকে এক পেয়ালা চা দিতে, শুধু এক পেয়ালা চা– আমি ভালো হয়ে যেতাম রে।

শুধু এক পেয়ালা চায়ের জন্য মায়ের এই আক্ষেপ। –এও কি ভাবা যায়?

সত্যি এমনই বেদনা ভরা ছিল চার্লি চ্যাপলিনের ছেলেবেলা। বিবর্ণ ছিল সকাল–দুপুর–সন্ধ্যে ও রাত।

তিনি নিজেই বলেছেন, কষ্টের মধ্যে থাকাই আমাদের অভ্যেস। দারুণ অভাবের মাঝে কাটাতে হয়েছে দিন রাত।

শৈশব পেরিয়ে যাবার পর যখন যে কাজ পেয়েছেন তাই করেছেন চার্লি। কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো খেলনা বানানো– আরও কত কী! কিন্তু নিজের লক্ষ্য থেকে তিনি কখনোই ফিরে আসেননি।

কী সেই লক্ষ্য? চার্লির লক্ষ্যই ছিল শিল্পী হওয়া। আমি অভিনয় করব মায়ের মতো, বাবার মতো। দর্শকরা আমায় দেখে হাততালি দিবে, ধন্য ধন্য করবে –এই ছিল চার্লির স্বপ্ন।

কিশোর চ্যাপলিন

চার্লির বাবাও মায়ের মতোই নাটকে অভিনয় করতেন। তবে বাবা মেজাজিও ছিলেন। এ কারণেই চার্লি পরিবার বলতে বুঝতেন ভাই সিডনি, মা ও তিনি নিজে।

বাবার ব্যাপারটি ছেলে মায়ের কাছ থেকে জেনেছে। মা রাগ করে মাঝেমধ্যে চার্লিকে বলতেন, বাবার ধারা পেয়েছ না? তোমার কপালেও দুঃখ-কষ্ট আছে।

মায়ের বকুনি খেয়েও শুধু ভাবতেন আমি শিল্পী হব, অভিনয় করব মায়ের মতো। এ লক্ষ্য থেকে কখনোই তিনি সরে আসেননি।

তাহলে সব সময় ফিটফাট থাকতে হবে। সবচেয়ে ভালো জামাটি কেচে ধুয়ে পরতেন। জুতোতে কালি ব্রাশ দিয়ে ঘষে সুন্দর করে তুলতেন। তাকে যেন দেখতে ভালো লাগে। সবাই যেন একবার হলেও তাকিয়ে দেখে তাকে।

এ কথাটি মাথায় সব সময় কাজ করত। সাজগোজ শেষ হলে যেতেন বেডফোর্ট ব্ল্যাকমুরের অফিসে। অফিসটি থিয়েটারের অভিনেতা সরবরাহের কাজ করে।

সে কথাটি মনে করে চ্যাপলিন বলেছেন নিজের সেই ধৈর্য্যের কথা। মনে পড়লে এখন অবাক হয়ে যাই। তখন সপ্তাহে পেতেন পঁচিশ পাউন্ড। তিনজনের সংসার ভালোভাবেই চলত।

তবে মায়ের গলার স্বরটা প্রায়ই বাদ সাধত। অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যেত মায়ের, তারপর গলা বসে যেত। অভিনয় করতে গেলে সবার আগে সুন্দর কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। আর এই কণ্ঠস্বর নিয়ে সমস্যা ছিল চার্লির মায়ের। ভাঙা কণ্ঠস্বর নিয়েই অভিনয় করতেন তিনি। বিশ্রাম না পেয়ে কণ্ঠস্বর আরো খারাপ হয়ে যেত । হয়ত স্টেজে গান গাইছেন মা, হঠাৎ করে উঁচুতে গিয়ে স্বর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেল। দর্শকরা এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করত।

এমনি করে মা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যেতে থাকেন। নাটকে অভিনয় করতে কেউ তাকে ডাকে না। এক সময় অভিনয়ের জন্য ডাক পাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

চার্লির বয়স যখন পাঁচ

সে সময়টা তার সুখের ছিল। অভাব–অনটন কিংবা মায়ের দুশ্চিন্তার কথা ঠিকমতো বোঝার বয়স ছিল না। মজার ব্যাপার হলো, পাঁচ বছর বয়সে চার্লি যখন এইটুকুন তখনই তিনি প্রথম মঞ্চে এসে দাঁড়ান।

এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না । মঞ্চে উঠে গান গাইতে গাইতে মায়ের গলা হঠাৎ বেসুরো হয়ে গেল। এ নিয়ে দর্শকরা খুব হাসছে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা দর্শকরা কখনই অনুভব করতে পারেন না। মায়ের বেসুরো গলায় গান শুনে দর্শকরা হইচই করে উঠে। গোলমাল বাড়তেই থাকে দর্শক সারিতে।

কোনো উপায় না দেখে মা একসময় মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। মঞ্চে রেখে গেলেন এইটুকুন চার্লিকে। বিশাল মঞ্চে চার্লি একা। উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে মা একলা ছেলেকে দেখতে থাকেন।

ঝকঝকে হীরের টুকরোর মতো আলো এসে পড়ে চার্লির চোখে–মুখে। রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা ভাবে এই পুঁচকুটা করবে কী?

আর তখনই 'জ্যাক জোন্সে'র চির পরিচিত গানটাই ধরল ছেলে, ভারি মজার গান। মঞ্চে ঝরঝর করে টাকা এসে পড়তে থাকে। চার্লি সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে টাকা কুড়োতে থাকেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আগে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিই, তারপর বাকি গানটা গাইব। একরত্তি ছেলের কথা শুনে দর্শকরা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেন। স্টেজ ম্যানেজার এলেন রুমাল নিয়ে। সেই রুমালে টাকাগুলো জমা করতে থাকেন। কুড়োতে কুড়োতে চার্লি আপনমনে বললেন, এই লোকটা টাকাগুলো নিয়ে নেবে নাকি?

দর্শকরা পুঁচকুর কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। চার্লি দেখলেন স্টেজ ম্যানেজার মায়ের হাতে রুমালের সব টাকা তুলে দিয়েছেন, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে মঞ্চে ফিরে এলেন। আবার গান গাইতে শুরু করেন।

এক সময় গাইতে গাইতে মায়ের সুর অনুকরণ করে গাইতে থাকেন ছোটো চার্লি। গানের মাঝখানে মায়ের গলা যেমন ভেঙে গিয়ে বেসুরো হয়ে যেত, তেমনই মায়ের অনুকরণে তিনি ভাঙা গলায় গান গাইতে থাকেন।

অমনই হাসির রোল উঠে দর্শকদের মাঝে। মঞ্চের ওপর ঝনঝন করে ঝরতে থাকে টাকাপয়সা। গানের শেষে ছেলেকে নিতে মা মঞ্চে এলেন , একটু আগেই যে দর্শকরা ব্যাঙ্গ–বিদ্রুপ করেছে মাকে নিয়ে তারাই এবার হর্ষধ্বনি করে উঠে।

মায়ের মঞ্চে উঠা সে রাতেই শেষ হলো, শুরু হলো চার্লির অভিনয় জীবন। পাঁচ বছরের ছোট্ট চার্লি হয়ে উঠলেন অভিনেতা।

শীত জাঁকিয়ে পড়েছে ভীষণ। ঠান্ডায় মায়ের গলার অবস্থা আরো খারাপ হবে, ছেলে এ কথাটি ভাবছে, মঞ্চে গান গেয়ে চার্লির বেশ টাকা উঠেছিল, সেই

টাকা ও মায়ের যা সঞ্চয় ছিল সব একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে। মায়ের গহনাপত্র কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সংসারের যা আসবাবপত্র একটি একটি করে বিক্রি করতে হচ্ছে। তবু মায়ের আশা, মায়ের স্বপ্ন– শীত একটু একটু করে কমে যাবে, তার গলা আবার আগের মতো ভালো হয়ে যাবে। আবার মঞ্চে উঠে গান গাইবেন মা। চার্লিও সেই স্বপ্ন দেখে– দর্শকরা আবার হাততালি দিয়ে উঠবে। কিন্তু ছেলে আর মায়ের ভাবনার মতো কিছুই আর আগের মতো হলো না।

অভাবের কারণে তিন কামরার বাসা ছেড়ে চার্লিরা উঠে এল দু'কামরার বাড়িতে। জীবনের উজ্জ্বল রং ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। চার্লির দু'চোখের সামনে মা আর আগের মতো নেই। শীর্ণ শরীরে তিনি চার্লির হাত ধরে গীর্জায় চলে আসেন। ধর্ম আলোচনা শুনতে শুনতে মায়ের চোখ জলে ভরে আসত । চোখ থেকে ঝরে পড়া জলবিন্দু শীর্ণ হাত দিয়ে মুছতেন মা। মায়ের বিষণ্ন মুখ আর অশ্রুজল দেখে চার্লির মনটাও কেঁদে উঠত ।

হাসিখুশিমাখা আগের সংসারের সুখ-আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মা যে ভীষণ হাসিখুশি ছিলেন । বাড়িতে সেকা পাউরুটি– মাংসের মনকাড়া গন্ধ ঘরটি জুড়ে ভুরভুর করত। সেই দিনগুলো হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের মতো জেগে থাকে চার্লির মনে।

আত্মজীবনীতে চার্লি বলেছেন, যেন দুঃখ আমাদের নিত্যসঙ্গী। গোটা জীবনটা যেন কষ্ট করতেই আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি।

মা ছিলেন চার্লির সদাসঙ্গী। অবসর পেলেই বই পড়ে শোনাতেন, অভিনয় করে দেখাতেন। মায়ের দিকে অপলক তাকিয়ে চার্লি মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। মহামানবদের চমৎকার কথাগুলো ছেলেকে সহজ করে বুঝিয়ে বলতেন মা হান্নাহ হিল। মায়ের গভীর প্রভাব পড়েছে তার জীবনে। একথা তিনি আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন। কারণ মা-ই তো ছিলেন ছেলের সঙ্গী। ছোটোরা যখন আক্ষেপ করে, মা-বাবার ওপর রাগারাগি করে, অভিমান করে কখনো বলে আমার বল নেই, কী করে আমি খেলোয়াড় হবো? আমার ক্রিকেট ব্যাট নেই, কী করে ক্রিকেট প্লেয়ার হবো? এসব যে কত তুচ্ছ ব্যাপার চার্লির জীবনী পড়লে বোঝা যায়। তার তো কিছুই ছিল না। পাঁচ বছর বয়স থেকে সংসার চালাবার জন্য রোজগার করতে মঞ্চে উঠেছেন, সবার জীবন সুন্দর করতে। স্বপ্নপূরণ করতে দরকার একাগ্রতা ও লক্ষ্য। কথাটি যে সর্বাংশে সত্যি চার্লির জীবনের কথা জানলে তা বোঝা যায়। চার্লি আত্মজীবনীতে বলেছেন– খুবই নিম্নমানের জীবন কাটাতে হয়েছে। চার্লি কথাবার্তার মাঝে নিম্নমানের শব্দটি বাক্যের মাঝে বার বার বলতেন। কিন্তু মা মিষ্টি করে সাবধান বাণী শোনাতেন। বলতেন, আমরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের, তুমি শালীনভাবে কথা বলো সোনা। তুমি কথাবার্তার মাঝে এসব শব্দ ব্যবহার করে নীচে নেমে যেতে পারো না।

মাকে কোমল স্বরে চার্লিও অভিযোগ করতেন। তুমি কেন অভিনয় ছেড়ে দিলে মা, তাহলে তো আমাদের এমন কষ্ট হতো না। মা জবাব দিতেন, অভিনয়ের জগৎ হলো নকল, মিথ্যে। কথাটি মুখে বললেও অভিনয়ের টুকরো টুকরো গল্প, মজার স্মৃতি সব ভাগ করতেন ছেলের সঙ্গে। অভিনয়ের সঙ্গেই যে তার পুরো জীবন জড়িয়ে আছে। ফেলে আসা দিনের কথা বলতে বলতে মায়ের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, খুশির আলো ছড়িয়ে পড়ত সারা মুখে। ছেলে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনত মায়ের বলা গল্প। ছোট্ট কামরাটি কলমুখর হয়ে উঠত আনন্দে।

গল্প বলতে বলতে মা মাঝেমধ্যেই চুপচাপ হয়ে যেতেন। গল্প থামিয়ে একমনে বসে সেলাই করতেন। মুখে কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ছেলেদেরও চিনতে পারতেন না।

কদিন পর আবার ঠিকঠাক হয়ে যেতেন। তখন আদর করতেন ছেলেদের। কলকল করে হেসে উঠতেন, গুনগুন করে গান গাইতেন। মলিন ঘরটি আবার ঝকঝকে হয়ে উঠত। মায়ের এই যে হঠাৎ করে সবকিছু ভুলে যাওয়া আবার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসা–অসুখের সূত্রপাত তখন থেকেই শুরু হয়েছে।

চ্যাপলিন (বামে) তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র মেকিং আ লিভিং (১৯১৪)-এর পরিচালক হেনরি লেরম্যানের সাথে

মায়ের ভাবনার তো আর শেষ ছিল না। মগজের ভেতর ঘুরে বেড়াত নানা কথা। এই তো শীত আসছে। দু'ভাইয়ের পশমের জামাকাপড় নেই অতএব কী করা। মা সত্যিই ম্যাজিক জানতেন। নিজের পুরনো ভেলভেটের জ্যাকেট কেটে সিডনিকে কোট বানিয়ে দিলেন।

কিন্তু মায়ের সব কষ্ট বিফলে গেল। সিডনির গায়ে সেটি ঠিকঠাক মতো না হওয়ায় ওর কান্না আর থামে না। সিডনির এক কথা– স্কুলের বন্ধুরা যে এই ঢলঢলে কোট পড়ে গেলে আমায় খ্যাপাবে। আদর করে দু'ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে স্কুলে পাঠালেন মা। এছাড়া তো তার আর করার কিছু ছিল না।

সিডনিকে দেখে সহপাঠীরা খ্যাপাতে লাগল, এই বলে– এই দ্যাখ দ্যাখ, রং-বেরঙের কোট পড়ে জোসেফ আসছে। চার্লিকে পরতে হয়েছিল মায়ের একজোড়া মোজা। খুব শীত পড়েছে। এছাড়া তো কোনো উপায় নেই।

চার্লিকে দেখে স্কুলের বন্ধুরা বলত, আসুন আসুন ফ্রান্সিস ড্রেক, আসতে আজ্ঞা হোক। এমন ধারা ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের মাঝে দু'ভাইয়ের অসহনীয় দুঃখের দিন কাটছিল।

এদিকে মাঝে মাঝেই মা অসুস্থ হয়ে যেতেন। সিডনি ও চার্লি কোট ও মোজা পরে স্কুলে যাবার দিনগুলোতে হয়ত মানসিক যন্ত্রণায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মাথা তার প্রচণ্ড ব্যথা। সেলাইয়ের কাজ একটুও করতে পারছেন না, কোনো আয় নেই। শুধু সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কায়ক্লেশে দিন কাটছে।

সিডনি তখন খবরের কাগজ বিক্রি করা শুরু করেছে। এতে তো আর তিনজনের সংসার চলে না। দু'ছেলে নিয়ে অসহায় একজন মা দারিদ্র্যের চরমসীমায় পৌঁছে গেছেন।

ঠিক এমনই সময় আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। পরম করুণাময় যীশুর কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনাটি হলো, খবরের কাগজ বিক্রি করেতে গিয়ে আচমকা একটি টাকার ব্যাগ খুঁজে পেল সিডনি। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়িতে এসে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগটি সে মায়ের হাতে দেয়। এতে একগাদা খুচরো পয়সা। ব্যাগের গোপন খোপের মাঝে সাতটি সোনার গিনি।

চার্লির মা নীতিপরায়ণ ও মধুর স্বভাবের ছিলেন। ব্যাগে মালিকের ঠিকানা থাকলে কখনোই তিনি তা নিতেন না বরং মালিকের কাছে ব্যাগটি ফিরিয়ে দিতে ছেলেদের বলতেন। কিন্তু ব্যাগটিতে মালিকের কোনো ঠিকানা ছিল না। তবে যে হারিয়েছে তার দুর্ভাগ্যের কথা বলে আহাজারি করতে থাকেন মা। একসময় বলে উঠলেন, করুণাময় যীশুই এই দান আমাদেরকে দিয়েছেন।

ঘটনাটির পর পরই মা সুস্থ হয়ে উঠলেন, হয়ত দৈনন্দিন অভাব-অনটনের কারণেই মায়ের এই

অসুস্থতা। চার্লি জানে, যা করা উচিত মা তাই করেন বা সব সময় করেছেন। মালিকের ঠিকানা থাকলে চার্লিকেই বলতেন ব্যাগটি ফেরত দিয়ে আসার জন্য। ব্যাগে ঠিকানা না থাকায় এই টাকাগুলো ওরা খরচ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এই টাকার কারণে মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন ও সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মনে মনে ঈশ্বরকে বার বার ধন্যবাদ জানায় চার্লি। হাতে টাকা আসায় মা দু'ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। তিনজন মিলে বহুদিন পর কিছু সুখ কুড়িয়ে নিলেন। আনন্দে পাগলপারা হয়ে যান মা ও দুই ছেলে। সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটা, পায়ের নিচের বালি ছুঁয়ে, ফোয়ারার মতো জল ছিটানো– এভাবেই হেসে-খেলে সুখের সময়গুলো কেটে যায়।

মায়ের সাথে বিচ্ছেদ

টাকা ফুরিয়ে যাবার সাথে সাথে দুঃখের দিন আবার ফিরে এল। এবার কী করা? পেটের খিদে কীভাবে মিটানো যাবে। সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেন মা। কাজের বিনিময়ে গরিবদের খাবার দেওয়া হয় ল্যামবেথ আশ্রমে। তাহলে খাবার তো জুটেই যাবে-কথাটি ভেবেই খুশি চার্লি। নতুন এক জায়গায় ওরা থাকবে ভেবে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠে সে। কিন্তু স্বপ্ন তার চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

আশ্রমের গেট পার হয়ে ভেতরে যেতেই আবার মন খারাপ। মায়ের সাথে থাকতে পারবে না ভেবে খুব কান্না পায় চার্লির। মা থাকবেন মহিলা মহলে, দু'ভাই শিশু বিভাগে। টাকাপয়সার ভাবনা তো মায়ের সব সময়ই ছিল, এর মাঝে অসুখ নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বুড়িয়ে গেছেন মা। তার চেহারার কোমল লাবণ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে দু'ভাই কাঁদলেন অনেকক্ষণ। দু'ভাই ও মা আলাদা হয়ে গেলেন। তারপর যখন নিয়ম অনুযায়ী সিডনি ও চার্লির সঙ্গে দেখা হতো মায়ের, তখন তিনজনের খুশির সীমা থাকত না। চার্লির মনে হতো, ওদের মনের খুশি ছুঁয়ে আকাশ-বাতাস-সাগর একসঙ্গে গেয়ে উঠেছে।

মা বাড়তি রোজগারের টাকা দিয়ে দুটো নারকেলের সন্দেশ কিনে আনতেন। এতেই খুশি ওরা। এভাবেই অল্প সময় মায়ের কাছাকাছি থাকতে পেরে আনন্দে বুকের ভেতরটা ওদের ভরে যেত।

মায়ের কাছাকাছি থাকার এ সুখও কপালে সইল না ওদের। দু'ভাইকে বদলি করা হলো হ্যানওয়েল বিদ্যানিকেতনে। লন্ডন থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে।

বুকের ভেতরে রাশি রাশি কষ্ট, চোখ ভেজা ভেজা। যাবার পথে যেতে যেতে ঝাপসা চোখে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন চার্লি। মনোরম পথ। সারি সারি কাঠবাদামের গাছ। নানারকম ফলের বাগান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গম ক্ষেত। গম পেকে সোনালি রং ধরেছে। রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, তাই দিনের সময়টুকু মায়াবি বাতাসে মিশে আছে মাটির সোঁদা গন্ধ। পথ পাড়ি দিতে দিতে চার্লি ভালোবেসে ফেললেন হ্যানওয়েল বিদ্যানিকেতনকে।

এ বিদ্যানিকেতনে থাকার সময় গোটা গোটা অক্ষরে চার্লি নিজের নাম লিখতে শিখলেন– চ্যাপলিন। এখানে যত্নের অভাব ছিল না মোটেও, তবে বড়ো একাকী ছিলেন চার্লি । কিছুতেই তার মনমরা ভাব কাটে না। দুঃখ তাকে ছেড়ে যায় না।

ছোটোদের মনে যে কত রঙের খেলা– চার্লির জীবনীগ্রন্থ পড়লে তা জানতে পারি ভীষণভাবে। পরবর্তী জীবনে যে মানুষকে সবাই চিনতে পেরেছে তার নিজের গুণে, যে মানুষটিকে হাসির রাজা বলে সম্মানিত করেছে দর্শকরা– ছেলেবেলায় তাকেই বিনা দোষে সইতে হয়েছে অত্যাচার।

বিদ্যানিকেতনে চার্লি কিছুই অন্যায় করেননি কিন্তু তারপরও যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো– রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন তিনি। একটু কৌতূহল, কিছুটা জানার ইচ্ছে, দোষ না করে দোষী হওয়ায় অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ কাজ করছে ছোট্ট বুকের ভেতরে। তাই তো শাস্তি হিসেবে যখন ক্যাপটেন হিনড্রাম তার শরীরে তিন ঘা বেত মারলেন, তিনি একটুও কাঁদেননি।

বড়ো ভাই সিডনি তখন নিয়মানুযায়ী কাজ করতেন রান্নাঘরে। ভাইকে দেখতে পেলেই মাখনের পুর দেওয়া রোল তার হাতে গুঁজে দিত। ভাইয়ের দেওয়া

মজার খাবারগুলো কখনও চার্লি একা খেতেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতো।

এই যে লুকিয়ে খাবার আনন্দ, দোষ না করেও খামোখা ক্যাপটেন হিনড্রামের হাতে বেতের ঘা খাওয়া– সবকিছুর মধ্যে কিশোর বয়সের এক ধরনের রোমাঞ্চের জন্ম দিত বালক চার্লির মনে।

শিশু-কিশোরদের হৃদয়কে বুঝতে হলে ওদের চরিত্রের এই দিকটিও তলিয়ে দেখতে হবে। নিজের চুলও যে ছোটোদের খুব পছন্দ– তাও চার্লির আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। দাদ হয়েছে বলে তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে খুব মন খারাপ হয়েছিল। তবে এমনিতেও মা-বাবা চুল একটু বড়ো হলেই ছেঁটে দেন কিংবা ন্যাড়া করে দেন। এ দিকটিও অভিভাবকদের ভেবে দেখা উচিত। বড়োরা

বয়সে বড়ো বলেই যে ছোটোদের ওপর সবকিছু করার অধিকার রয়েছে তা কিন্তু নয়। নিজেদের মাথা ভর্তি চুল ওদের খুব প্রিয়, চার্লির নিজের কথায় তা আমরা জানতে পারি।

শিশুরা মা-বাবাকে সব সময় কাছে পেতে চায়। যখনই মায়ের সাথে ওরা একসঙ্গে থাকতে পেরেছে তখনই মায়ের মুখ সোনার আলোয় ভরে গেছে। মাকে চার্লির মনে হতো এক গুচ্ছ ফুলের মতো। মা যখন আদর করে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, ওরে– তুই আমার বড়ো আদরের ধন, সাত রাজার ধন মানিক, তখন চার্লির বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে যেত।

যাযাবরের মতো জীবন

মা, সিডনি ও চার্লি একটি বাড়িতে আবার একসাথে থাকতে শুরু করলেন, আর্থিক সংকটের কারণে মাঝে মাঝে দলছুট হয়ে যাওয়া, আবার তিনজন মিলে একসঙ্গে থাকা– এভাবেই যাযাবরের মতো চলছিল ওদের জীবন।

কিছুদিন পর মায়ের মাথায় আবার যন্ত্রণা শুরু হলো। মাথায় কিছুটা গোলমাল দেখা দিল। এবার দু'ভাই আবার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দু'ভাইয়ের ঠাঁই হলো বাবা চার্লস চ্যাপলিন আর সৎমা লুইজির কাছে।

মা হারা দুই সন্তানকে ভালোবাসতেন বাবা কিন্তু লুইজির দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল দু'ভাই। কোনো কোনো দিন এমনও হয়েছে মা–বাবা ঘরে ফিরেননি, তালাবদ্ধ বাড়ি– তখন রাস্তায় ওদের রাত কাটাতে হতো। খিদে পেলেও দু'ভাই খেতে পেতেন না, উপোস করে অনেক রাত ওদের কাটাতে হয়েছে।

এই অবর্ণনীয় কষ্টের সময়ে মা আবার ভালো হয়ে ফিরে এলেন। কেনিংটন ক্রসের পেছনে নেওয়া হলো নতুন বাড়ি। এ সময়টাতে দিনগুলো আবার ভালো কাটতে থাকে। আদালতের আদেশে সিডনি ও চার্লির দায়িত্ব নিতে হলো বাবাকে। বাবাকে প্রতি সপ্তাহে দশ শিলিং করে দিতে হতো আর এটা তিনি ঠিক

সময় মতো পাঠিয়ে দিতেন।

মা দু'ছেলেকে কাছে পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলো আবার মন দিয়ে করেন। অবসর সময় নতুন নতুন সেলাই করে ঘরকে সাজিয়ে তোলেন। চার্লি তাঁর হারিয়ে যাওয়া আনন্দকে আবার ফিরে পেল। এভাবেই শৈশব থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত জীবনের অনেকটা সময় চার্লির কেটেছে দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে। অকপটভাবে তিনি বলেছেন– কষ্টের মধ্যে থাকাই আমাদের অভ্যেস। এই সত্যি কথাটি তিনি বার বার উচ্চারণ করেছেন।

মা আর বড়ো ভাই সিডনির সঙ্গে একসাথে থাকাকেই বড়ো সুখ বলে মনে করতেন চার্লি। কিন্তু অভাবের কারণে তার এই ছোট্ট চাওয়াটুকু পূরণ হয়নি সব সময়। তবে শুধু একাগ্রতা ও লক্ষ্য স্থির থাকার কারণে তিনি পৃথিবী জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। একটানা অভাবের মধ্যে থেকেও যে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া যায় তাই প্রমাণ করে গেছেন তিনি। একাগ্র সাধনায় যে মনের ইচ্ছে পূরণ হয়– চার্লিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ছোট্ট এই পরিবারটিকে অভাব এমন এক পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছিল যে, বাড়িতে রান্নার কোনো চুলোও ছিল না। চার্লি একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়িতে তুমি রাঁধো না কেন মা? প্রশ্নটি মায়ের বুকে শেলের মতো বিঁধেছিল। তাই শুধুমাত্র ছেলের জন্য মা একদিন অল্প মাংস কিনলেন। বাড়িতে মাংস ঝলসানোর উনুন নেই তাই বাড়িওয়ালার উনুনের মাঝে রেখে এসেছিলেন মাংস খণ্ডটি। একটু বেশিই পুড়ে গিয়েছিল উনুনের আঁচে। তবু বাড়িতে মায়ের পাশে বসে পোড়া মাংসের স্বাদ চাখতে গিয়ে উৎসবের মতো মনে হয়েছিল চার্লির।

শৈশব থেকে বালক বয়সি চার্লির দুঃখ-কষ্টের গাথা শুধু বলেছি। এমন পরিবেশ থেকে যে মানুষ পৃথিবী বিখ্যাত হতে পারে– চার্লিই তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

তাঁর পুরো নাম– চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন। তবে তিনি চার্লি চ্যাপলিন নামেই পরিচিত। বাবার নাম– চার্লস চ্যাপলিন সিনিয়র, মা– হান্নাহ হিল।

অশেষ দুঃখের সেতু অতিক্রম করে তিনি আপন চেষ্টায় হয়ে উঠেছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ কৌতুক অভিনেতা। শুধু তাই নয়, তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন প্রযোজক, লেখক, পরিচালক, বিখ্যাত কমিক শিল্পী। বিখ্যাত 'দ্য চ্যাম্পিয়ন' ছবিটি চার্লি চ্যাপলিন রচিত ও পরিচালিত। এটি ১৯১৫ সালের মার্কিন হাস্যরসাত্মক নির্বাক চলচ্চিত্র। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি নিজে। এ ছবিটির ডিরেক্টর– চার্লি চ্যাপলিন। চিত্রনাট্য– চার্লি চ্যাপলিন।

তিনি নীরব চলচ্চিত্রের যুগে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি 'দ্য ট্র্যাম্প'– এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আইকন হয়ে উঠেন। অফুরন্ত জাজের মাধ্যমে চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি বিবেচিত হন। অথচ এই মানুষটিকে মাঝেমধ্যেই উপোস করে কাটাতে হয়েছে। এসব কারণে প্রায়ই চার্লি মনমরা হয়ে থাকতেন। ঘরে খাবার কিছুই নেই– কী খাবেন? নিজেই তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে– যার মা নেই, তার এত খাই খাই কেন?

পরবর্তীকালে বিখ্যাত হওয়া মানুষটি রোজগারের আশায় পুরনো পোশাক দিয়ে ফুটপাতে পশরা সাজিয়েও বসেছেন অনেক সময়। এও কী ভাবা যায়? অভাব-অনটনের সময়, উপোস করে থাকার কষ্টে প্রিয় মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণার সময়, চার্লির একটি ভাবনাই ঘোরাফেরা করত মাথার ভেতরে– অভিনয় করতে হবে, শিল্পী হতেই হবে।

ভাবলে অবাক হতে হয়, স্কুলে সিন্ডারেলা নাটকে চার্লি অভিনয়ের সুযোগ পাননি। এজন্য তিনি থেমে থাকেননি মোটেও। অভিনয়ের চেষ্টা করে গেছেন অবিরত। পরবর্তীতে তার স্বপ্ন ও সাধনা তাকে অভিনয়ের জগতে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। একটু একটু করে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আকাশছোঁয়া স্বীকৃতি পেয়েছেন। 'শার্লক হোমস' নাটকে তিনি কাজের লোক বিলি'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

সপ্তাহে ছিল আড়াই পাউন্ড মাইনে। সেই থেকে জীবনটা ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে তার। অন্য এক নাটকে অভিনয় করলেন স্যামির ভূমিকায়, এরপর করলেন 'জিম' এবং 'ফুটবল'-এ।

জীবনের প্রাথমিক সাধনার কারণে অনেক জায়গা থেকে ডাক পেতে থাকেন চার্লি। কাজে ডুবে থাকতেই ভালো লাগত তার। বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে তরুণ, তরুণ থেকে যুবক হওয়া পর্যন্ত নিরন্তর জীবনযুদ্ধ করে গেছেন তিনি। এভাবেই পরিপূর্ণ ও সফল অভিনয় শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

এক সময় ভাগ্য তাকে এমন জায়গায় দাঁড় করালো যে– নাটক, মঞ্চ সফল না হলেও তার অভিনয়ের প্রশংসা সবাই অকৃপণভাবে করত। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এভাবেই তিনি দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। খিদের জ্বালা মুখ থুবড়ে পড়ে রইল পেছনে। সফলতার কারণে পরবর্তী জীবন আর আগের মতো কষ্টকর তো ছিলই না বরং সুখ ও সাফল্যে টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল তার জীবন। চার্লি তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'এতদিনে সকলের কি মনে পড়ল এ নামের একটি ছেলে আছে, তাকে ভালোবাসা খাতির করা দরকার।'

পুরনো দিনের কথা ভেবে তার অনেক কষ্ট হতো বুকের ভেতরে। মায়ের চমৎকার একটি মন ছিল। অভাব-অনটন ও সাংসারিক নানা দুঃখের কারণে সব স্বপ্ন ভেঙে বারবার চুরমার হয়ে গেছে। এসব ভেবে বিষাদ বিধুর হয়ে উঠত তার মন। মা বাইরে বেরুলেই এক পেনি দামের ফুলের তোড়া এনে ঘর সাজাতেন, সেই প্রিয় মা মানসিক রোগী হয়ে গিয়েছিলেন সার্বক্ষণিক অভাব-অনটনের কারণে।

চার্লির সফলতার পেছনে মায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। স্কুলের পড়াতে যখন মন বসত না, পড়াশোনা না করার জন্য মা তাকে বকুনি দিতেন না। তিনি ছেলেকে বুঝতেন, ছেলেটির মন জড়িয়ে আছে অভিনয়ের মাঝে। অভিনয় প্রতিভা টগবগ করে ফুটছে তার ছোট্ট চার্লির বুকের ভেতরে। তাই যখন সময় পেতেন ছেলেকে যত্ন করে অভিনয়ের পাঠ শেখাতেন। সত্যিকার অর্থে মায়ের হাত ধরে অভিনয়ে চার্লির হাতেখড়ি।

ছোটোবেলা মা চার্লিকে একটি আবৃত্তি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কবিতাটির নাম ছিল– 'কুমারী প্রিসিলার বেড়াল।' একদিন টিফিনের সময় ক্লাসের এক বন্ধুকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিল, সে সময় একজন টিচার তা দেখে ফেলেন, বাহ দারুণ তো।

টিচার ওর আবৃত্তি শুনে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, প্রতিটি ক্লাসে গিয়ে চার্লিকে শোনাতে হলো 'কুমারী প্রিসিলার বেড়াল' কবিতাটি।

সফলতার শীর্ষে উঠেও চার্লি ভুলতে পারেননি হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো, বিশেষ করে সেই দিনটির কথা– যেদিন মঞ্চে উঠে গাইতে গাইতে মায়ের গলা ভেঙে যাওয়ায় পাঁচ বছর বয়সে তাকে মঞ্চে উঠতে হয়েছিল।

সে সময় স্কুল ছেড়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের এক ঝুমুর দলে যোগ দিয়েছিলেন। এভাবেই শুরু হয়েছিল অভিনয়ের পথে চার্লি চ্যাপলিনের পদযাত্রা। এরপরও কিন্তু জীবন মসৃণ পথে চলেনি।

নিজেকে তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। এইটুকুন বালক নিজের নানা কৌশল ভেঙেছেন, গড়েছেন। এক সময় সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চাও করেছেন। এমনকি মনোহরী দোকানে ফাইফরমাশও খেটেছেন। এত পরিশ্রমের মাঝেও মনে স্থির আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়ো হবার। বুকে আশার ঢেউ, আমাকে যে বড়ো হতেই হবে।

অভিনয় জগৎ এক শৃঙ্খলার জগৎ। সময়মতো হাঁটা-চলা-বলা। অভিনয় হলো– ছন্দময় জীবন। সৌভাগ্য এসে হাতের মুঠোয় ধরা দিল পরিণত হবার সাথে সাথে। তখন মঞ্চ থেকে সিনেমা জগতে পা রাখেন তিনি। হু হু করে তার চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে। দর্শকদের কাছে তিনি আদরের চার্লি, প্রিয় চার্লি হয়ে উঠে।

শুধু মায়ের বিষণ্ন মুখ ও করুণ কথাগুলো বুকের ভেতরে বেহাগের মতো বাজত– 'তুই যদি বিকেলে

আমাকে অন্তত এক পেয়ালা চা খাওয়াতিস আমি ভালো হয়ে যেতাম।'

মায়ের এই আক্ষেপগুলোতে চার্লির বুকের ভেতরটা কেঁদে উঠত। চার্লির পরিহাসের পেছনে সব সময় লুকিয়ে রয়েছে ছেলেবেলার অস্ফুট বেদনা।

জীবনকে দেখেছেন তিনি হৃদয় দিয়ে। তাই তার অভিনয়ের ছাপ পড়েছে স্বচ্ছ জীবনে। চলচ্চিত্রের শিল্পী জগতে চ্যাপলিনের প্রভাব অনস্বীকার্য। 'নতুন দারোয়ান' ছবির গল্পটি এমন ছিল–ম্যানেজার চার্লিকে বরখাস্ত করেছেন। চার্লি মূকাভিনয় করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন চাকরিটি খুব প্রয়োজন তার। বাড়িতে অনেক বড়ো পরিবার, অনেকগুলো ছেলেপুলে। চার্লির অভিনয় এত বাস্তব হয়েছিল যে তখনকার দিনের বড়ো মাপের অভিনেত্রী ডরোথি ডেভেনপোর্ট কেঁদে ফেলেছিলেন।

বিশ্ববরেণ্য এই কৌতুক অভিনেতা একটি বড়ো শিক্ষা দিয়ে গেছেন সবাইকে, দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয় পেলে চলবে না। দুঃখ-বেদনার মুখোমুখি রুখে দাঁড়াতে হয়। নিজের উপলব্ধি করা জীবনবোধ নিয়ে তিনি অনেকগুলো উক্তি করে গেছেন। শিক্ষণীয় বলে কয়েকটি উক্তি এখানে তুলে দিলাম ছোট্ট বন্ধুদের জন্য।

১. এই বিশ্বে স্থায়ী কিছুই না, এমনকি আমাদের সমস্যাগুলোও না
২. সরলতা অর্জন করা কঠিন ব্যাপার
৩. আমরা বেঁচে থাকি অন্যদের আনন্দ দিয়ে দুঃখ দিয়ে নয়
৪. আমি বৃষ্টিতে হাঁটি যাতে কেউ আমার অশ্রু দেখতে না পারে
৫. নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলে আপনি কখনও রংধনু দেখতে পাবেন না
৬. হাসি হলো ঔষধ, যেটা দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়
৭. সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকা যায়।
৮. ধীরেসুস্থে অগ্রসর সবচেয়ে ভালো পন্থা
৯. নগণ্য ভেবে কাউকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়
১০. কোনো যুগে কোনোকালেই সুন্দরের বিনাশ হয় না।

ভাই সিডনি আর মায়ের সঙ্গে তখন চার্লির সুখের দিন কাটছিল। বাড়িটি ছিল আচারের কারখানার পাশে। বিকেল হলেই আচারের টক টক গন্ধে বাতাস ম ম করত। বাবা ঠিক সময় তার অনুদান দশ শিলিং পাঠিয়ে দিতেন। মা আগের মতো সেলাইয়ের কাজ মন দিয়ে করতেন।

সেই সময়কার ঘটনা– রাস্তার শেষ মাথায় ছিল একটি কসাইখানা। চার্লিদের বাসার সামনে দিয়ে রোজ কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয় ভেড়ার দলকে। একদিন এক ঘটনা ঘটল– একটি ভেড়া দলছুট হয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে ছুট দিল। অমনি হই হই রই রই কাণ্ড। ছোট্ট চার্লি বেশ মজা পাচ্ছেন ওসব দেখতে। ভেড়ার মালিকরা নানাভাবে চেষ্টা করছে ভেড়াটিকে

মানোইর দে বান, সুইরজারল্যান্ডের কর্সিয়ের-সুর-ভেভিতে চ্যাপলিনের বাড়ি।

ধরতে , কিন্তু পারছে না। ভেড়াটি মরার ভয়ে কেমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে– এ কথা ভেবে চার্লি মজা পেয়ে খুব হাসছেন। একটি অসহায় ভেড়ার পেছনে তাড়া করছে অগণিত মানুষ– কতক্ষণ আর পালিয়ে বাঁচবে সে। ভেড়াটি অবশেষে ধরা পড়ল। কাঁধে করে একটি লোক ওকে নিয়ে চলল কসাইখানার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে ভেড়াটির পরিণতির কথা ভেবে হঠাৎ চার্লির মন খারাপ হয়ে যায়। একটু আগেই তো প্রাণপণ ছুটছিল ভেড়াটি, হাসছিলেন তিনি, এবার মনে পড়ল ওর পরিণতি তো মৃত্যু।

একদিকে জীবন অন্যদিকে মৃত্যু– এ কথাটি চার্লির ছোট্ট বুকের ভেতরটাকে আলোড়িত করতে থাকে। ফেনিয়ে উঠতে থাকে কান্নার ঢেউ। বুকের ভেতর আছড়ে পড়তে থাকে রাশি রাশি বেদনা। ছুটে গেলেন বাড়ির ভেতরে। মায়ের বুকের পরম আশ্রয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকেন– ওরা ওকে মেরে ফেলবে মা।

বহুদিন তার বুকের ফ্রেমের ভেতরে ছবি হয়ে ছিল সেই করুণ স্মৃতি। একটা মজার, আরেকটা দুঃখের। পরবর্তীকালে তার ছবির কাহিনিতে মিশেল হয়ে ঘুরে ফিরে এসেছে ব্যথা ও আনন্দ। বিশ্ববরেণ্য এই কৌতুক অভিনেতাকে পরবর্তীতে দেখা গেছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, নাট্যকার বার্নাডশ, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল লর্ড মাউন্টব্যাটেন, প্রখ্যাত পিয়ানো বাদক গোদাকির সঙ্গে। খিদের জ্বালা প্রতিনিয়ত যে বালকটিকে সহ্য করতে হয়েছিল তিনি নিজ কর্মদক্ষতা ও প্রতিভার কারণে এমন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যার কোনো পরিসীমা নেই।

চার্লি চ্যাপলিন একটি বড়ো শিক্ষা দিয়ে গেছেন পৃথিবীর মানুষকে। বলেছেন – দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয় পেলে চলবে না। হ্যাঁ, ঠিক তাই অপার দুঃখকে তিনি অসীম শক্তি দিয়ে জীবনের প্রতি মুহূর্তে জয় করে গেছেন। দূর্বিষহ শৈশব- কৈশোর পার করে এলেন, তবু জীবনের কাছে হার মানেননি তিনি। তাই তো তিনি জীবন জয়ী।

শুধু ছোটোরা নয়, বড়োরাও তার জীবনযুদ্ধের সত্যি গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হবেন।

অশেষ দুঃখ–কষ্টের মাঝে থেকেও তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। তাই তো সহজভাবে বলতে পেরেছেন ‘আমার জীবনে অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু আমার ঠোঁট তা জানে না। তাই সব সময় হাসতে থাকে।’ মহান এই অভিনেতা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ১৯৭৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ভোরে ঘুমের মধ্যে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তার নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। এত বছর পরও মানুষের কাছে তার আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। তিনি এখনও সবার প্রিয় বলেই–তার ব্যবহার করা টুপি, হাতের লাঠি ৮৩ হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়েছে। আজও ‘চার্লি’ কিংবা ‘চ্যাপলিন’ নাম দুটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ শত দুঃখেও প্রাণখুলে হেসে উঠে।■

শিশুসাহিত্যিক

অনলের দাদু

শিবশঙ্কর পাল

কেউ বলে অনলের দাদুর বয়স ষাট বছর, আবার কেউ-বা বলে, না না সত্তরের কাছাকাছি হবে। এই বয়স নিয়ে অনেকের মধ্যে বাকবিতণ্ডাও হয়ে যায়। ব্যাপারটা কখনো কখনো ঝগড়াতেও গড়ায়। আসলে অনলের দাদুর প্রকৃত বয়স আটাত্তর থেকে আশির মধ্যে। এই প্রকৃত বয়স কারো কাছে বলতে গেলেও সমস্যা হয়,

কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারে না যে এটাই তাঁর প্রকৃত বয়স। কারণ, তার চেহারা এখনো মধ্যবয়সি মানুষের মতো, এখনকার মানুষের বয়সের তুলনায় অনলের দাদু যে কতটা ফিট আছেন তা বলে বোঝানো যায় না। এই বয়সেও তিনি যেমন ঘরে তেমন বাইরে দিব্যি চলাফেরা করেন এবং কাজকর্ম করেন। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, রোজ সকাল ও বিকালে নিয়ম করে হাঁটেন। এমনকি পরিমাণ মতো খাদ্য খান। শুধু তাই না, তাঁর মতো দাপট ও মেজাজ নিয়ে এ এলাকায় খুব কম লোকই চলাফেরা করে। এমনকি ইউনিয়নের মেম্বার- চেয়ারম্যান পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলেন। কারণ এলাকায় অনলের দাদুর একটা আলাদা পরিচয় আছে– তিনি এলাকায় 'বীর-কমল' নামে পরিচিত। প্রকৃত নাম কমলকান্ত।

কমলবাবুকে নিয়ে একটা গল্প চালু আছে এলাকায়। গল্পটা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বছরের। পাক-মিলিটারিরা জিপ নিয়ে এ গ্রামে ঢুকে একটা রাজাকার বাহিনী তৈরি করেছিল। তারা রাজাকারদের নির্দেশ দিয়েছিল সমস্ত বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে। পাড়ার কয়েকটা বাড়িতে আগুন দেওয়ার পর যখন কমলকান্তবাবুর বাড়িতে আগুন দিতে আসে রাজাকাররা তখন কমলবাবু একা একটা হাসুয়া নিয়ে তাদের তাড়া করে মাঠ ছাড়া করেছিলেন। পরে রাজাকাররা আর অন্যান্যদের বাড়িতে আগুন দেয়ার সাহস পায়নি। যুদ্ধের পর তার এই ঘটনার কথা যখন এলাকায় জানাজানি হয় তখন কেউ কেউ তাকে 'বীর' বলে সম্বোধন করতে থাকে, এবং এভাবেই তিনি 'বীর কমল' হিসেবে পরিচিত হন। কমলবাবু ছিলেন যেমন তেজি তেমন সাহসী। আর তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের পরম ভক্ত। তার ঘরে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের একটা সাদা-কালো পুরানো ছবি আছে। ছবিটা তিনি অনেক যত্ন করে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন। কবে থেকে আছে তা অনল জানে না, হয়ত তার জন্মের আগে থেকে হবে।

অনলরা দুই ভাই বোন। অনল ছোটো, পড়ে ক্লাস সেভেনে। আর দিদি ঐন্দ্রিলা পড়ে কলেজে। দিদি পড়াশোনা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেও অনল দাদু ঠাকুমার সাথে বেশি সময় কাটায় আর বাইরের বিভিন্ন বিষয় জানার চেষ্টা করে। দাদুর সাথে অনল পাড়া ও পাড়ার বাইরে বের হলেও ঠাকুমার কাছে বসে শোনে পুরানো দিনের নানান গল্প-কথা। আর ঠাকুমাও অনলকে কাছে পেয়ে যেন গল্পের ভাণ্ডার খুলে বসেন। সে কত রকমের গল্প-কথা– শেষই হয় না! অন্যান্য গল্পের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গল্পও আছে। এ গ্রামে যখন পাক-মিলিটারি আসে তখন বিভিন্ন রকম অত্যাচার শুরু করে তারা। প্রাণ ভয়ে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে ছিল। তাদের পরিবারের আঠারো-কুড়িজন মানুষের মধ্যে কেবল অনলের দাদু কমলকান্তই দেশে নিজ গ্রাম নিজ বাড়িতে ছিলেন, বাকিরা সব ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। অনল তার ঠাকুমার কাছে বিভিন্ন সময়ে শুনেছে দেশে যখন যুদ্ধ লাগে তখন তার বাবা শ্যামল কেবলমাত্র বছর দুই/তিনের শিশু, অন্যান্য কাকা-পিসিরা তখনো জন্মেনি। তখন তার দাদু কমলকান্ত ছিলেন যেমন তেজি তেমন সাহসী, আর শক্ত-সামর্থও। পাড়ায় হা-ডু-ডু খেলায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না, এ এলাকা তো বটেই অন্যান্য এলাকাতেও তার সুনাম ছিল। জাতি ব্যাবসা মাটির হাঁড়ি পাতিলের কাজের পাশাপাশি বিকেল হলেই বন্ধুদের নিয়ে হা-ডু-ডু খেলায় মেতে থাকতেন তিনি। আবার দুপুরবেলা স্নানের সময় হলেই বাড়ির কাছের বড়ো পুকুরটায় বার দুই এপার-ওপার সাঁতার না দিলে নাকি তার সকালের পেটের ভাত হজমই হতো না। আর একটা সখ ছিল তার, কাজে ফাঁক পেলেই বেড়াতে বের হতেন বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে। সে যত দূরেই হোক না কেন, তার যাওয়া চাই-ই চাই। আর এই বেড়ানোর নেশা থেকেই যুদ্ধের বছরে তিনি বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে শহরের এক বন্ধুর সাথে চলে গিয়েছিলেন সুদূর ঢাকায়।

এর পরের গল্প অনল শুনেছিল দাদুর নিজের মুখেই। টেলিভিশনের পর্দায় যখন শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের দৃশ্য ভেসে উঠে তখন দাদু ছলছল চোখে বলত, 'এ... এই... এইখানে আমি আছি... আমি আছি।...' দাদুর কথা শুনে অনল বলত, 'ধুর দাদু, কী যে বলো না তুমি! তুমি এখানে থাকবে কী করে?' অনলের মাথায় ঢোকে না ব্যাপারটা সহজে। ও দাদুর

দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকে। দাদু মাথা ঝাঁকিয়ে জোর দিয়ে বলতেন, 'সত্যি বলছি রে! এই জনসমুদ্রে আমি সত্যি আছি।'

দাদুর কথায় অনলের বিশ্বাস হয় না 'বলে, সেই কবে যুদ্ধের বছর ৭ই মার্চের ভাষণ হয়েছে। আর তুমি বলছ তুমি ওখানে আছো। তুমি ওখানে গিয়েছিলে কীভাবে?'

দাদু চোখ দুটো চকচক করে বলত, 'গেছি রে আমি গেছি ওখানে। তোদের ঠাকুমাও জানত না সে-কথা! জানলে কি আর আমাকে ঐ সময় ঢাকায় যেতে দিত?'

তারপর একদিন দাদু অনলকে পাশে বসিয়ে শুনিয়েছিল সেই কাহিনি– 'আজকের মতো সেতুর ওপর দিয়ে সেই সময়ে এত সহজে ঢাকা যাওয়া যেত না। আমাদের এই উত্তরাঞ্চল থেকে খুব কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে সেখানে পৌঁছানো লাগত। শহরে আমার এক বন্ধু একদিন খুব করে ধরেছিল আমাকে ঢাকায় নিয়ে যাবে, ঢাকা শহর ঘুরে দেখাবে। ওর ছিল মোটরের পার্টস অর্থ্যাৎ লোহা-লক্করের ব্যাবসা। ও প্রায়ই ওর ব্যাবসার কাজে ঢাকায় যাতায়াত করত, ঢাকায় গিয়ে দু-চারদিন থাকতও। আমরা শহরে বাসে চড়ে রওনা দিলাম। তারপর একের পর এক বাস বদলিয়ে প্রথমে পৌঁছলাম নগরবাড়ি ঘাটে। সেখানে আছে যমুনা নদী, সেই নদীর জল কালো রঙের। যমুনা নদীর বুকে চলত লঞ্চ স্টিমার আর ফেরিতে করে পারাপার হতো গাড়ি। চার-পাঁচ ঘণ্টা কখনো কখনো ছয়-সাত ঘণ্টাও লেগে যেত সেই নদী পার হতে। তারপর ওপারে আরিচা ঘাটে নেমে আবার বাসে করে ঢাকা শহরে ঢুকতে হতো। এতে সব মিলিয়ে সকালে রওনা দিলে ঢাকায় পৌঁছাতে রাত হয়ে যেত। আমরা সেদিন একেবারে রাতে ঢাকায় পৌঁছেছিলাম।

> তাঁর বজ্রকণ্ঠের ভাষণে চারদিক গমগম করে উঠল। একেকটা কথার মধ্যে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটতে থাকল। হাতের আঙুল উঠানো আর ঝাঁকানোতেই ছিল যেন এক একটা নির্দেশনা। আর কথাগুলো যেন কামানের গোলার মতো চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকল দিকবিদিক।

ঢাকায় আমার শহরের সেই বন্ধুর এক বোন থাকত, সেখানেই আমরা গিয়ে উঠলাম। রাতের খাওয়া সেরে আমরা মহাজনের দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। দুপুরের দিকে একটা সিনেমা হলে ঢুকে সিনেমাও দেখলাম। রাতে আবার কয়েকটা জায়গায় ঘুরে আমার সেই বন্ধু কেনাকাটা করল। পরদিন আমাদের ফেরার কথা, কিন্তু রাতেই শুনলাম পরদিন ঢাকায় একটা বিরাট জনসভা হবে; সেখানে শেখ মুজিব ভাষণ দেবেন। আমি শেখ মুজিবকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। এত কাছে এসে তাঁকে দেখব না তাই কি হয়! বন্ধুকে সে কথা বলতেই ও কিছুটা বেঁকে বসল। পরে আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত ও রাজি হলো এবং সেখানে দু'জনই যাব বলে ঠিক করলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা মিছিল করে লোকজন ছুটছে মাঠের দিকে। আমিও সকালে বের হওয়ার চিন্তা করতেই আমার সেই বন্ধুটি হঠাৎ বলল যে সে যাবে না। আরো কিছু মাল সে কিনতে যাবে অন্যখানে।

এদিকে আমি ঢাকা শহরে একেবারে নতুন মানুষ, পথঘাট কিছুই চিনি না। একা চলতে পারব কিনা তাই নিয়ে ভাবছি। আমার বন্ধুটি অবশ্য আমাকে সেখানে রেখে আসার কথা জানালে আমি তাতে সায় দিলাম। সেই মোতাবেক আমাকে সে একটা মিছিলের সাথে নিয়ে গিয়ে সেই রেসকোর্স মাঠে রেখে এল। জনসভা শেষে আমি কোন জায়গায় গিয়ে থাকব সেটাও আমাকে সে বলে দিলো। আমি তখন সেই বিশালাকৃতির মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত রকমের লোকজন দেখছি আর মঞ্চের দিকে তাকাচ্ছি। মাঠের ভেতরে চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ। মনে হচ্ছে এক সমুদ্দুর

মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছে। তিল ধারনের কোথাও জায়গা নেই। মানুষ থই থই করছে আর থেকে থেকেই বিভিন্ন রকম স্লোগান উঠছে। অনেকের হাতে লাঠিসোঠা, মানুষের মাথা ছাপিয়ে সেগুলো উপরে নড়াচড়া করছে। মঞ্চে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন নেতারা বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে অবশ্য কাউকেই চেনা যাচ্ছিল না বা তেমন ভাবে দেখা যাচ্ছিল না। আমার তখন জিদ চেপে গেল একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর। আমি মনে মনে দিকচিহ্ন রেখে অসংখ্য মানুষের ভিড় ঠেলে ঠেলে একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। যখন বুঝতে পারলাম একেবারে সামনের কাতারে যাওয়া সম্ভব না তখন এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখান থেকেই অবশ্য মঞ্চটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। তখনো শেখ মুজিব মঞ্চে আসেননি, অথচ তাঁর কথা বার বার মাইকে শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে এল সেই সময়, চারদিকে হঠাৎ শোরগোল উঠল। শেখ মুজিব মঞ্চে এলেন দুপুরের পর পরই। মুহুর্মুহু করতালি আর স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল রেসকোর্স মাঠ। আমি আশপাশের কথা ভুলে গিয়ে শেখ মুজিবের দিকেই চেয়ে থাকলাম বিমুগ্ধ হয়ে। কী সৌম্য চেহারা! সাদা পাঞ্জাবির ওপর কালো কোট। কী বলিষ্ঠ দেহ! শেখ মুজিব তাঁর ভাষণ শুরু করলে সকলে একেবারে চুপ করে গেল। শুরুতে ধীরলয়ে শুরু হওয়া ভাষণ ক্রমে গর্জে উঠতে থাকল। তাঁর বজ্রকণ্ঠের ভাষণে চারদিক গমগম করে উঠল। একেকটা কথার মধ্যে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটতে থাকল। হাতের আঙুল উঠানো আর ঝাঁকানোতেই ছিল যেন এক একটা নির্দেশনা। আর কথাগুলো যেন কামানের গোলার মতো চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকল দিগ্‌বিদিক। তাঁর কথা শুনে আমার শরীরের ভেতরে কম্পন শুরু হয়ে গেল, রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকল। নাওয়া-খাওয়া সবকিছু ভুলে মিশে গেলাম জনতার মধ্যে। হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে স্লোগান দিতে থাকলাম সবার সঙ্গে। সে কী যে উন্মাদনা বলে বোঝানো যাবে না। ভাষণের শেষের দিকে শেখ মুজিব যখন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বললেন তখন যেন পুরো রেসকোর্স মাঠ কেঁপে উঠল।

অনলের দাদুর আরো একটা পরিচিতি ছড়িয়ে আছে এলাকায় যে, তিনিই এই এলাকার একমাত্র ব্যক্তি যিনি কিনা ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সময় সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কারো দেখার সৌভাগ্য হয়নি সেই সময়ে।

সেই কারণে বিশেষ দিবসে এলাকা বা এলাকার বাইরের অনুষ্ঠানগুলোতে অনলের দাদুর ডাক পড়ে। অনলের দাদুকে সেই ঐতিহাসিক দিনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের ঘটনার কথা মাইকে সবাইকে বলে শোনাতে হয়। এ নিয়ে অবশ্য অনলেরও গর্বের শেষ থাকে না। দাদুকে নিয়ে বেশ গর্ব করে অনল। তবে একটা বিষয় অনলের মাথায় ঢোকে না, দাদু বলেন তিনি সেদিন সেই ঐতিহাসিক জনসভায় ছিলেন। অথচ অনল শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ কতবার টিভিতে দেখেছে, আবার বিশেষ দিবসগুলোতে ওদের হাটের ওপরে সন্ধ্যার পর বায়োস্কোপ আসে। তো সেখানে সেই ছবিতে নানান লোকের ভিড়ে দাদুর মুখ খুঁজেছে কিন্তু সে পায়নি। এই কথা একদিন দাদুকে জিজ্ঞেস করাতে দাদু বলেছিল, 'ছবি কি আর সব মানুষের আছে রে? ছবিতে তো অল্প কিছু মানুষকে দেখা যায়। ওখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কতজনের ছবি ক্যামেরায় উঠবে বল!' সত্যি তো, অনল এটা ভেবে দেখেনি কখনো। তবে এলাকার এত মানুষের মধ্যে তার দাদু যে ওখানে গেছে এই সত্যটাই অনল বিশ্বাস করে, গর্ব করে তাই দাদুকে নিয়ে। দাদু ওদেরকে কাছে পেলে মাঝে মাঝেই বলেন, 'শেখ মুজিবের মধ্যে অসাধারণ একটা ক্ষমতা ছিল। তা না হলে একটা মানুষের কথা সেই মাঠ ভর্তি মানুষ সকাল থেকে শোনার জন্য একত্রিত হয় কীভাবে! আর সারাদেশের মানুষ তাঁর কথা শোনার জন্য সেদিন রেডিওতে কান পেতে ছিলেনই বা কেমন করে! কারো মধ্যে বিশেষ কোনো ক্ষমতা না থাকলে এটা সম্ভব না বুঝলি।... উনি অনেক বড়ো নেতা ছিলেন!'

অনল দেখেছে কথাগুলো বলার সময় দাদুর চোখ ভিজে ওঠে। চোখ দুটো কেন ভিজে ওঠে অনল তা বুঝতে পারে না কখনো। ■

গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক

পাসওয়ার্ড

মুহাম্মদ ইসমাঈল

কোটিপতি নিজাম সাহেবের একমাত্র মেয়ে নাফিছা সবেমাত্র চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছে এ বছর। লেখাপড়ার মাথাটা খুব ভালো মেয়েটার। সবাইকে পেছনে ফেলে প্রতি ক্লাসেই সে প্রথম হয়। প্রতিদিনের মতো তার মা খালেদা মেয়েকে স্কুলের জন্য প্রস্তুত করে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসেন। ড্রাইভার আব্দুর রহিম মিয়া নাফিছাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে আসে প্রতিদিনের মতোই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজগর সাহেব তার অফিসের ডেস্কে বসে প্রয়োজনীয় কী একটা ফাইল নাড়াচাড়া

করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ একটা যুবক এসে হাজির হয় দরজার সামনে। সালাম দিয়ে বললেন– স্যার ভিতরে আসতে পারি?

আজগর সাহেব বললেন, হ্যাঁ আসুন।

আগন্তুক যুবক বলল আমি নাফিছার দূর সম্পর্কের মামা। আজগর স্যার জিজ্ঞেস করলেন, নাফিছাকে কেন নিয়ে যেতে এসেছেন?

আগন্তুক যুবক বলল, হঠাৎ নাফিছার বাবা অসুস্থ হয়ে এখন হাসপাতালে। খুব খারাপ অবস্থা। বাসায় কেউ নেই। তাই আমি নিতে এসেছি।

শেষ বারের মতো মেয়েটাকে একটু দেখতে চান। তাই এসেছি স্যার।

আগন্তুক যুবকের কথা শুনে প্রধান শিক্ষকের মন একটু খারাপ হলেও কেমন জানি সন্দেহ লাগছিল তার। তারপরেও দপ্তরিকে বেল দিয়ে ডেকে বললেন নাফিছাকে নিয়ে আসার জন্য।

কিছুক্ষণ পর দপ্তরি আজাদ মিয়া নাফিছাকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন।

আজগর স্যার নাফিছাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই ভদ্রলোককে চেনো মা?

নাফিছা বলল, না স্যার উনাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

আজগর স্যার বললেন, উনি বলেছে তোমার বাবা নাকি অসুস্থ। এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তোমাকে দেখতে চেয়েছে একবার, তাই তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

হঠাৎ করে নাফিছা বলে উঠল– স্যার উনাকে আমার মায়ের দেওয়া লিখিত পাসওয়ার্ড বলতে বলেন।

কথা শুনেই আগন্তুক যুবকটা ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে থাকে।

প্রধান শিক্ষক আজগর স্যার যুবকটাকে প্রশ্ন করার আগেই ছুটে পালিয়ে যায় অফিস কক্ষ থেকে। স্যার অবাক হয়ে নাফিছাকে জিজ্ঞেস করে কীসের পাসওয়ার্ড মা।

নাফিসা তখন বলল, আমার মা বলেছেন অপরিচিত কোনো ব্যক্তি যদি সঙ্গে যেতে বলে, অবশ্যই তার শিখিয়ে দেওয়া গোপন পাসওয়ার্ডটা জিজ্ঞেস করে নিতে। যদি ব্যক্তিটি বলতে পারে। তখন তার সঙ্গে যেতে। নতুবা নয়। অন্যথা বুঝতে হবে কোনো কুমতলব বা গোলমাল রয়েছে।

প্রধান শিক্ষক আজগর সাহেব একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নাফিছার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি ক্লাসে যাও মা। তোমার মা যেমন বুদ্ধিমতি তুমিও তেমনি বুদ্ধিমতি। যেমন মা তেমন মেয়ে। তুমি আজ আমাদের সবাইকে বাঁচালে। আর নাফিছা যথারীতি ক্লাসে ফিরে গেল। ■

গল্পকার

সাবরিনা ইসলাম
দ্বিতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল

আদুরে প্রাণী কোয়ালা

মঈনুল হক চৌধুরী

বন্ধুরা, তোমরা কি এই ছবির প্রাণীটির সাথে পরিচিত? কেউ কেউ হয়ত প্রাণীটিকে পত্রপত্রিকার পাতায় কিংবা টিভি চ্যানেলে দেখে থাকবে। কেউ হয়ত তার সম্পর্কে নাইবা জানতে পারো। সমস্যা নেই। তবে বলছি শোনো। প্রাণীটির নাম কোয়ালা। প্রাণীটির নাম শুনেই কেমন কেমন লাগছে তোমাদের তাই না?। আসলেই ঠিক। আদুরে এই মিষ্টি চেহারার প্রাণীটি কিন্তু আমাদের দেশের কোনো প্রাণী নয়। কোয়ালা বাস করে শুধুমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে। খুব কম এলাকায় থাকে বলে সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলে কোয়ালাদের খুব ভালোবাসা ও আদরের সাথে রাখা হয়। উল্লেখ্য, 'কোয়ালা' শব্দের ইংরেজি অর্থ হলো 'ডাজ নট ড্রিংক' যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় -'পানি পান করে না'। তাদের এমন নামের অর্থ হওয়ার কারণ হলো কোয়ালারা কখনোই পানি পান করে না। গাছের পাতা থেকেই এরা পানির প্রয়োজন মেটায়। কোয়ালাদের বসবাসের জন্য গভীর জঙ্গল দরকার। অবাক হলেও সত্য, একটা কোয়ালার জন্য একশ গাছ না হলে এরা স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে না। কম জায়গায় পাওয়া যায় বলেই শুধু নয়, কোয়ালা দেখতে খুব মিষ্টি, একদম ছোটো একটা ভাল্লুকের মতো। তবে কোয়ালা কিন্তু ভাল্লুক না। কোয়ালার সঙ্গে শারীরিক গঠনে বরং ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে মিল রয়েছে। কোয়ালা ক্যাঙ্গারুর মতো দেখতে নয় তবে এরা ক্যাঙ্গারুর মতো বাচ্চাকে পেটের মধ্যে একটা আলাদা থলেতে বহন করে। এই থলেতেই মায়ের পেটে বাচ্চাটা বড়ো হয়। একটা কোয়ালা একবারে একটি মাত্র 'জোয়ি'কে বহন করতে পারে। 'জোয়ি' কে তা জানো কী? কোয়ালার থলের মধ্যে যখন বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চাটাকে 'জোয়ি' বলে। এ বিশেষ নামের কারণ হলো, কোয়ালার বাচ্চা জন্মের পরে একদম জেলিবিনের মতো দেখতে হয়। তারা

তখন চোখে দেখে না, তখন এমনকি ওদের কানও থাকে না। এইভাবেই তারা মায়ের পেট থেকে বের হয়। মানব শিশুরা মায়ের পেট থেকে বের হয়ে মায়ের কোলে আসে। কোয়ালার বাচ্চারা কিন্তু মায়ের পেট থেকে বের হয়ে এক অর্থে পেটেই থাকে। কোয়ালার পেটে যেই থলেটা থাকে সেই থলেতেই আরো কিছুদিন সময় তাকে কাটাতে হয়। মায়ের থলের মধ্যে 'জোয়ি'রা সাত মাস কাটায়। জন্মের পরে যখন তারা প্রথম মায়ের থলেতে আসে তখন তাদের শুধু ঘ্রাণশক্তি আর স্পর্শ শক্তি থাকে। বাকি সব কিছুর গঠন হয় এই সাত মাসে মায়ের থলের ভিতরে। থলের মধ্যে বাচ্চাগুলো যখন ছয় মাস পার করে তখন তাদের মায়ের 'পাপ' (pap) নামে একটি বিশেষ পদার্থ তৈরি হয়। এই পদার্থটি 'জোয়ি'দের দুধের সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়ানো হয়। এটার কারণও খুব মজার। এই পাপ নামে পদার্থটি আসলে 'জোয়ি'দের কোনো পুষ্টি দেয় না। বরং মায়েদের পেটের অন্ত্রে অবস্থিত কিছু ব্যাকটেরিয়াকে 'জোয়ি'দের অন্ত্রে দিয়ে দেওয়া হয়। এতে হয় কি! 'জোয়ি'রা স্বাভাবিক বড়োদের খাবার যেমন, ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খেলে হজম করতে পারে।

সাত মাস বয়স হলে 'জোয়ি'রা মায়ের থলে থেকে বের হয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খায়। তবে খাওয়া দাওয়া শেষে টুপ করে আবার মায়ের থলেতে ঢুকে যায় এবং সেখানে বসে মায়ের দুধ পান করে। এইভাবে একটা জোয়ির বয়স যখন এক বছরে এসে পৌঁছায়, তখন জোয়িরা মায়ের দুধ পান করা বন্ধ করে দেয় আর শুধু পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। কোয়ালারা দেখতে বেশ ছোটোখাটোই হয়। প্রাপ্ত বয়সে কুড়ি পাউন্ডের মতো ওজন হয়। দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আর এভাবে পাতা খেয়ে একটা কোয়ালা বেঁচে থাকে প্রায় ২০ বছর। পুরুষ কোয়ালা দিনের বেলায় তাদের প্রয়োজনীয় খাবার খুঁজে খায়। তবে স্ত্রী কোয়ালা পুরুষের মতো দিনের বেলায় খায় না বরং সে সময়টা তারা ঘুমিয়ে কাটায়। কোয়ালারা সাঁতার কাটতে পারে। অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি আছে তাদের। কোনো গাছের পাতা খাওয়ার আগে তা তারা শুকে নেয়। ফলে গাছের পাতাটি বিষাক্ত কিনা তা বুঝতে পারে। কোয়ালা নিশাচর প্রাণী হলেও খুব অল্প সময়ের জন্য রাতে চলাচল করে। দিনে খুব একটা চলাচল করে না। প্রায় সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি থেকে বাইশ ঘণ্টা ঘুমিয়েই কাটায়। এজন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘুমিয়ে থাকা প্রাণীদের মধ্যে কোয়ালার স্থান সবার শীর্ষে। আবারও বলি, অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় বন্যপ্রাণীর মধ্যে কোয়ালা অন্যতম। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ অনেকটাই বিলুপ্তপ্রায় আদুরে মিষ্টি স্বভাবের প্রাণী কোয়ালা। ■

কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

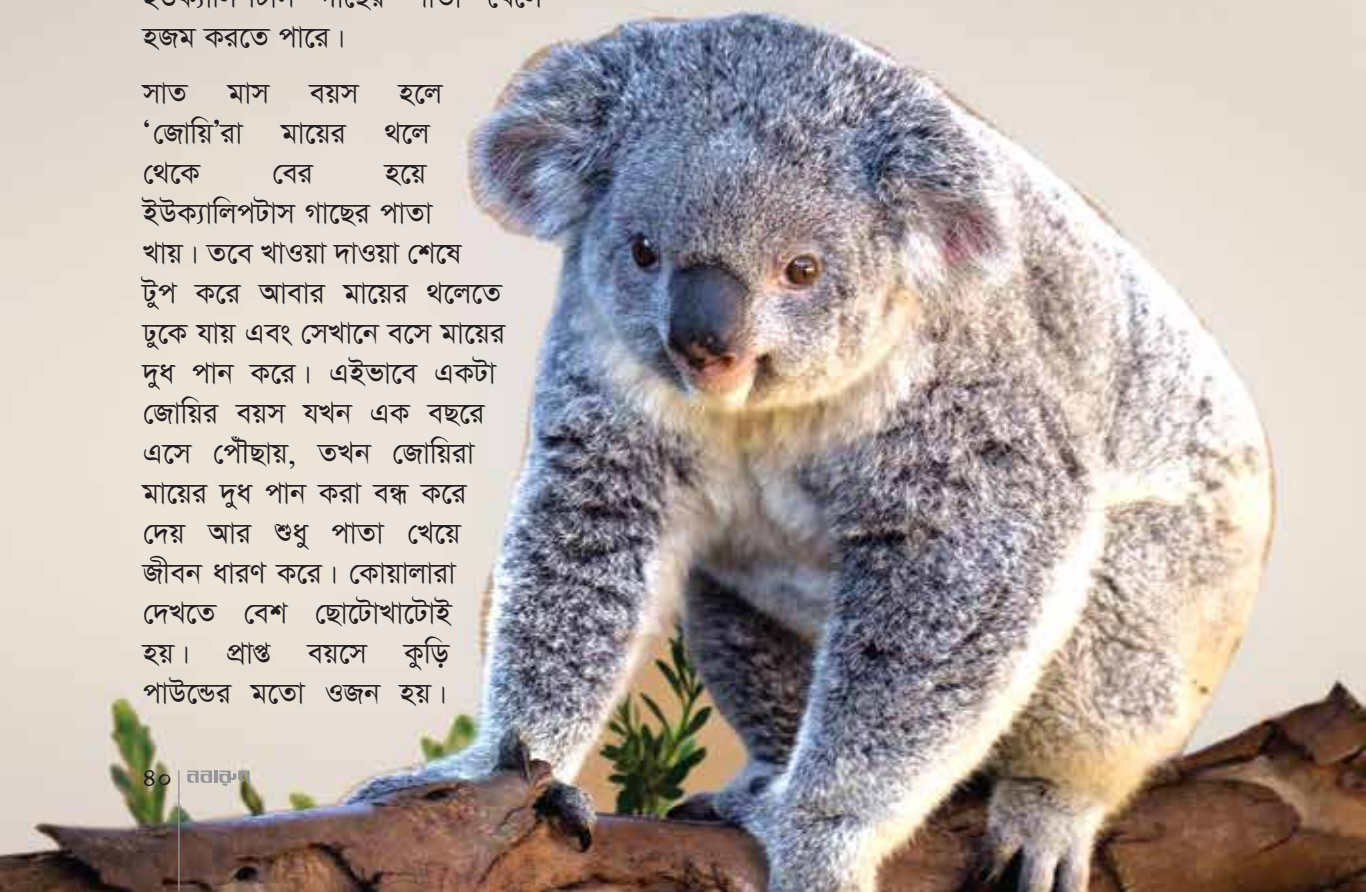

গল্প

সাপ ও বটগাছ

অমিত কুমার কুণ্ডু

কয়েকদিনের বর্ষায় পুকুর ভেসে গেছে। পুকুরপাড়ের একটা গর্তে সাপ বাস করত। পুকুরের কোলাব্যাঙ, ছোটো ছোটো মাছ খেয়ে তার দিন ভালোই কাটছিল। সুখেই ছিল সাপ। সুখের সময় বেশিদিন থাকল না। পুকুর ভেসে পানি ঢুকল সাপের গর্তেও। পানি পেয়ে গর্ত ভিজে গেল। সাপের বসবাস করতে বড়ো অসুবিধা হলো। আরও উঁচুতে কোনো গর্ত না খুঁজলেই নয়। গর্ত খোঁজা কী চাট্টিখানি কথা? সাপটা অত কষ্ট করতে গেল না। সে ঠিক করল দালানে থাকবে। মানুষের মতো।

দালানে মানুষেরা কত আরামে থাকে। রোদে পোড়ে না, বৃষ্টিতে ভেজে না, বৃষ্টি হলে যখন সব জায়গা তলিয়ে যায়, তখনও তাদের উঁচু উঁচু দালানগুলো দম্ভে দাঁড়িয়ে থাকে।

সাপ ঠিক করল, যত যাই হোক, আজ থেকে সে দালানেই থাকবে। যেই কথা, সেই কাজ। সাপটা তার বুকে ভর দিয়ে সরসর করে দালানের দিকে এগিয়ে চলল।

সাপকে যেতে দেখে বুড়ো বটগাছ বলল, ও সাপ ভাই, তুমি কোথায় চললে?

সাপ বলল, বৃষ্টির পানিতে মাটির গর্ত ডুবে গেছে। বড়ো কষ্ট হচ্ছে গর্তে থাকতে। তাই ঠিক করেছি, আজ থেকে আমি দালানে থাকব। মানুষের মতো। সে দিকেই যাচ্ছি।

সাপের কথা শুনে বুড়ো বটগাছের তো মাথায় হাত! বলে কী বোকা সাপ? দালানে থাকবে? বেঘোরে মারা পড়বে এবার। বটগাছ কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, তুমি বেঘোরে প্রাণ হারাবে ভায়া, মানুষেরা বড়ো

নিষ্ঠুর। আমি ওদের ছায়া দেই, বাতাস দেই, তবুও ওরা হাঁটতে হাঁটতে আমার ঝুলে থাকা ডাল ভাঙে, পাতাগুলো টেনে টেনে ছেঁড়ে। তুমি তো কোনো উপকারই করো না, তার উপর তোমার দাঁতে বিষ। তোমাকে দেখলেই ওরা মেরে ফেলবে। আমার কথা শোনো, ফিরে এসো। মাটিতে থাকতে না চাইলে আমার কোটরে থেকো।

বুড়ো বটগাছের কথা শুনে সাপ খুব রেগে বলল, আমার সুখ তোমার সহ্য হচ্ছে না, না? তুমি কোথাও যেতে পারো না তো, তাই কেউ দালানে থাকবে এটা তুমি মেনে নিতে পারছ না। ছলেবলে কী করে পরাধীন রাখবে সে কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছ। তোমার ইচ্ছা কোনোদিন পূরণ হবে না বাপু, আমি চললাম। আমি অন্য সাপের মতো না যে, তোমার আশ্রয়ে যাব। পারলে আমাকে ঠেকাও।

সাপের কথা শুনে বুড়ো বটগাছটা খুব কষ্ট পেল। তবুও তার জন্য প্রার্থনা করল। এতদিন এক জায়গায় সুখে দুঃখে ছিল। সাপের জন্য দুশ্চিন্তায় তার মন কেঁদে উঠল। মনে মনে বলল, তুই যেখানেই থাকিস, ভালো থাকিস। অন্তত বেঘোরে প্রাণটা যেন না হারায়।

এদিকে সাপটা বুকে ভর দিয়ে মহাজনের দালানের কাছে চলে এসেছে। দালানের গোড়ায় সাপ দেখে মহাজনের মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির ভেতর গিয়ে বাড়ির লোক ডেকে আনল। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়া-প্রতিবেশিরা এগিয়ে এল। খবর পেয়ে চারদিক থেকে মানুষজন ছুটতে ছুটতে আসতে লাগল। সাপ কিছু বুঝে উঠতে না পেরে একটা সুপারির জালার ভেতর গিয়ে লুকাল।

সবাই সেই জালা পাহারা দিতে শুরু করল। কারো হাতে বাঁশ, কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বর্শা। সাপ ভীষণ ভয় পেয়ে জালার ভেতর গর্ত খুঁজতে লাগল। জালার ভেতর কী গর্ত থাকে? থাকে না। অনেক চেষ্টা করেও সাপটা গর্ত না পেয়ে গুটিশুটি মেরে জালার ভেতর শুয়ে থাকল।

এদিকে মহাজন ওঝাকে খবর দিয়েছে। আলখেল্লা পরা জটাজুটো কাঁচাপাকা দাড়ির ওঝা দেখে সাপটা আরও জড়সড় হয়ে গেল।

ওঝা নানারকম মন্ত্র-টন্ত্র বলল, শিকড়-বাকড় বার করল, এরপর লম্বা সাঁড়াশি জালার মুখে ঢুকিয়ে সাপটাকে বাইরে বের করে আনল। সাপ ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। ওঝা সেটা দেখে সাপটার লেজ ধরে এমন এক ঝটকা মারল, এক ঝাটকাই সাপটা চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে নেতিয়ে পড়ল।

ওঝা মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাপটা ঝাঁপিতে ভরে হাসিমুখে বটগাছটার পাশ দিয়ে চলে গেল। বটগাছটার সাপটাকে বাঁচাবার অনেক ইচ্ছা থাকলেও কিছুই করার থাকল না।

এদিকে ওঝা সাপটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন না খাইয়ে ঝাঁপির ভিতর রেখে দিলো। সাপটা ঝাঁপির ভিতর থেকে বের হতে অনেক চেষ্টা করল। খিদের জ্বালায় ছটফট করল। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হলো না। ওঝার নির্দয় মন সাপের জন্য একটুও বিচলিত হলো না।

এভাবে সপ্তাহ খানিক যাবার পর ওঝা ঝাঁপির মুখ খুলল। সাপটা এতদিনের বন্দিদশায় মৃতপ্রায়। তবুও পালানোর চেষ্ট করল। ছোবল মারার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হলো না। ওঝার কৌশলের কাছে সাপ পরাস্ত হলো।

এরপর ওঝা বেদেদের কাছে সাপটাকে বেচে দেবার জন্য সাপের দুটি দাঁত ভেঙে দিলো। বিষদাঁত হারিয়ে সাপটা মুমূর্ষুপ্রায় হয়ে পড়ল। কয়েকদিন খাবার সামনে দিলেও খেতে পারল না। দাঁত ভাঙার যন্ত্রণায় ঝাঁপির ভিতর ছটফট করতে লাগল। আর বুড়ো বটগাছটার কথা ভেবে দু চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

ওদিকে কয়েকদিন পর বেদের দল এসে ওঝাকে কিছু টাকা দিয়ে সাপটাকে কিনে নিয়ে গেল। বেদের দল সাপটাকে নিয়ে মানুষের সামনে যায়। মানুষ ভয় পেয়ে বেদের দলকে টাকা দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। বাসে, ট্রেনে, হাটে, বাজারে, বেদেদের অত্যাচারে মানুষ নাজেহাল।

সাপটা কাঁদে আর ভাবে, মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে মানুষেরা যেভাবে ঠকায়, যেভাবে ভয় দেখায়, এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে যেভাবে প্রতারণা করে, তার তুলনায় তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা কিছুই নয়।

সাপটার এতদিনে অনেক বুদ্ধি হয়েছে। ভালো

মানুষের কাছ থেকে কিছু ভালো গুণ শিখেছে। এখন পালাতে পারলে বনে যেয়ে দাঁত না থাকলেও বুদ্ধির জোরে তার খাবারের কোনো অভাব হবে না।

সাপটা রোজ কতকিছু যে ভাবে। কতভাবে যে পালানোর চেষ্টা করে। তার কোনো গোনাগুনতি নেই। প্রতিদিন পালাবার চেষ্টা করে, প্রতিদিন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ঝাঁপির ভিতর গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে। তবে সে আশা ছাড়েনি। মানুষদের কাছ থেকেই শিখেছে আশা ছাড়তে নেই। চেষ্টা করে যেতে হয়। চেষ্টা থাকলে, মনে আশা থাকলে ঠিক একদিন কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি হয়। এটাও শিখেছে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। সুযোগ পেলে সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়।

একদিন সাপটার জীবনেও সুসময় এল। বেদেনি বাজার থেকে এসে ঝাঁপির মুখ বাঁধতে ভুলে গেল। ছেলের কান্না থামাতে ঝাঁপি ফেলে ছেলের কাছে দৌড়ে চলে গেল। এই সুযোগ। সাপটা তাড়াতাড়ি ঝাঁপির ঢাকনা সরিয়ে দে ছুট।

তখন রাত। সাপটা এ পথ ও পথ ঘুরে, এ বাজার সে বাজার হয়ে, অনেক কষ্টে ভোরবেলা বটগাছটার গোড়ায় এসে পৌঁছাল। বটগাছটাও সাপটাকে দেখে অবাক! সাপটা যে বেঁচে আছে এই অনেক। বটগাছটা কখনো মনের ভুলেও ভাবেনি, সাপটা আবার ফিরে আসতে পারবে।

তবুও সাপটা ফিরে এসেছে দেখে বটগাছটার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সাপটাকে বলল, অনেক ভাগ্য যে তুমি বেঁচে ফিরেছ। এরকম ভাগ্য খুব কম প্রাণীরই হয়। তবুও যখন বেরোতে পেরেছ, তখন আজ আর তোমার বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই বাপু। এসো তো, আমার কোটরে এসে আজ দিনটা কাটাও, এরপর ভালো না লাগলে না হয় রাতে অন্য কোথাও চলে যেও।

বটগাছটার কথায় সাপটা বটগাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নিল। এরপর সব ঘটনা একে একে বটগাছটিকে খুলে বলল। বটগাছ তো শুনেই অবাক। যত শুনছে তত তার গা শিউরে উঠছে।

এভাবে দুজনের গল্প চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। সাপটা বটগাছের কোটর থেকে বিদায় নিয়ে তার নিজভূমে, নিজের পুরানো গর্তে ফিরে গেল।

বিদায় নেবার সময় বলল, বটভায়া, আমি বুঝতে পেরেছি, নিজের ঘর যত খারাপই হোক না কেন, তা অপরের রাজপ্রাসাদ থেকে ঢের ভালো। আমি তো শিক্ষা পেয়েছিই, আমার বংশধরেরাও আমার এ পরিণতি থেকে নিশ্চয় শিক্ষা নেবে। তুমি ভালো থেকো। বেঁচে থাকলে আমাদের আবার দেখা হবে। তুমি তো বিপদের বন্ধু। তোমার ঋণ আমি কখনো ভুলব না। কান্না জড়ানো গলায় এসব বলতে বলতে সাপটা তার নিজের পুরনো গর্তে ফিরে গেল। বটগাছটা সাপের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল। বটগাছটার দুচোখে তখন আনন্দঅশ্রু টলমল করছে। ■

শিশুসাহিত্যিক

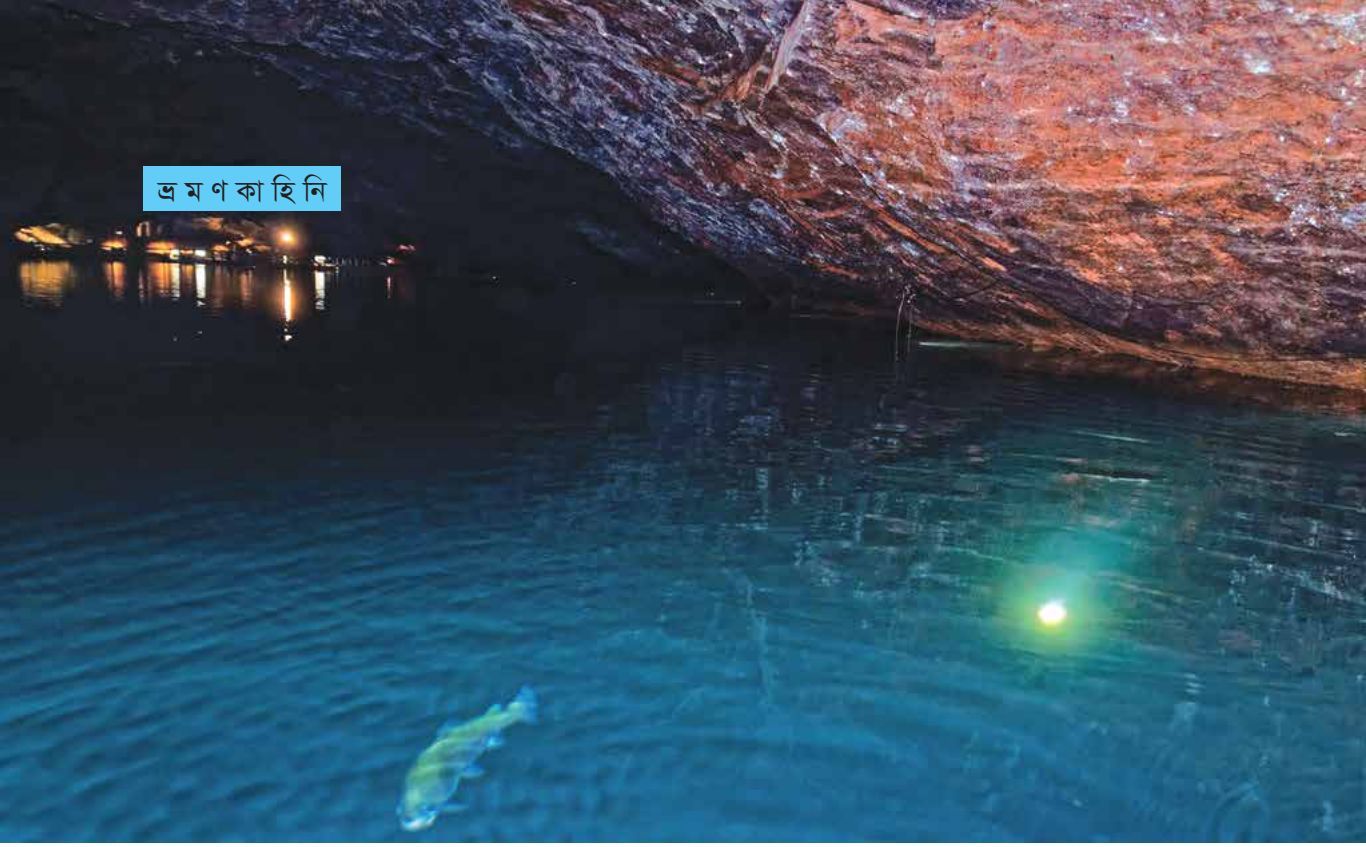

হারিয়ে যাওয়া নীল সমুদ্র

মীম নোশিন নাওয়াল খান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি স্টেটের সুইটওয়াটার শহরে অবস্থিত বিশাল বড়ো গুহা ক্রেইগহেড কেইভার্ন। এই গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির নিচের হ্রদ যা পরিচিত The Lost Sea বা হারিয়ে যাওয়া সমুদ্র নামে। ছুটিতে কোথায় যাব ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে খুঁজে পেলাম এই বিস্ময়কর জায়গার তথ্য। ছুটি শুরু হতেই বেরিয়ে পড়লাম অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে সেই রোমাঞ্চকর জায়গার উদ্দেশ্যে।

আগে থেকেই অনলাইনে টিকেট কেটে রেখেছিলাম, তাতে করে পছন্দমতো দিন এবং সময়ে যেতে পারার নিশ্চয়তা থাকে। ট্যাক্সসহ একেকজনের টিকেটের মূল্য পড়ে প্রায় ২৮ ডলারের মতো, বাংলাদেশি টাকায় যা আড়াই হাজার টাকার কাছাকাছি।

ক্রেইগহেড কেইভার্নে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতেই বাঁয়ে চোখ পড়ল কয়েকটা দোকান। এই জায়গাটার নাম দেয়া হয়েছে 'দ্যা লস্ট সি ভিলেজ'। একটা জেনারেল স্টোর, একটা কামারের দোকান, দুটো 'ইচ্ছেপূরণের কুয়া', একটা মিষ্টিজাতীয় খাবারের দোকান আর একটা গাসব্লোয়িং বা কাচ থেকে নানা রকম চমৎকার জিনিস তৈরির দোকান। গাসব্লোয়িং-এ আমার দারুণ আগ্রহ। তাই হাতে একটু সময় থাকায় সেখানে ঢুকলাম। কাচ দিয়ে তৈরি নানা রকম পশুপাখি, ফুল, নাম লেখা লকেট, যানবাহন, ড্রাগনসহ নানা কিছু। চোখ ধাঁধিয়ে যায়! একটা কাচের হামিংবার্ড ম্যাগনেট কিনে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। এরপর গেলাম তার উলটোদিকে 'দ্যা লস্ট সি ওয়েলকাম সেন্টারে'। সেখানেও নানা রকম জিনিস বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা আছে। বিভিন্ন রকম খনিজ পাথর, লকেট, ম্যাগনেটসহ অনেক স্যুভেনির।

আমাদের নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল তিনটা। তিনটা বাজতেই একজন ট্যুর গাইড এসে আমাদেরকে বলল তাকে অনুসরণ করতে। হাসিখুশি কমবয়সী মেয়েটিকে অনুসরণ করে হলুদ রঙের একটা টানেল দিয়ে হেঁটে আমরা চলে এলাম এক বিশাল বড়ো গুহায়! ক্রেইগহেড কেইভার্ন! ট্যুর গাইড আমাদেরকে গুহা ঘুরিয়ে দেখানোর সাথে গুহার খনির ইতিহাস বলল। খনি শ্রমিকেরা যখন এই গুহায় কাজ করত, এখানে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না। গুহাটা এত অন্ধকার ছিল যে কয়েক সপ্তাহ কেউ সেখানে থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে শুরু করত।

এখন পুরো গুহা বৈদ্যুতিক বাতিতে আলোকিত। আমাদের ট্যুর গাইড গুহার আসল অবস্থা দেখাতে আলো নিভিয়ে দিলে পুরো গুহাটা নিকষ কালো হয়ে গেল! চোখ বন্ধ আর খোলার মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না আলো নেভানোর পাঁচ মিনিট পরেও। ফের আলো জ্বালাতেই সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল– যাক! অন্ধ হয়ে যাইনি তবে!

গুহায় ঢুকে অনেকটা পথ নিচে হেঁটে গিয়ে প্রায় ৮০ ফিট নিচে নেমে পানির কুলকুল শব্দ আসে কানে। একটু এগিয়েই একটা ঝরনা! হ্যাঁ, ভূমি থেকে প্রায় ৮০ ফিট নিচে একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার গুহায় একটা ঝরনা! ঝরনার নাম ক্রিস্টাল ফলস। ক্রেইগহেড গুহায় মাটির নিচের এই যে হ্রদ– সেই হ্রদের পানির অন্যতম প্রধান উৎস এই ঝরনা। অন্য যে দুটো ঝরনা এই হ্রদের পানির উৎস, সে দুটো হ্রদের নিচে। এই পানি ৯৮% বিশুদ্ধ, বাকি ২% খনিজ।

The Lost Sea বা হারিয়ে যাওয়া সমুদ্র নামে পরিচিত মাটির ১৪০ ফিট নিচে অন্ধকার গুহায় স্বচ্ছ নীল পানির এই হ্রদের আয়তন সাড়ে চার একর, দৈর্ঘ্য ৮০০ ফিট, প্রস্থ ২২০ ফিট, এবং এটি ৭০ ফিট গভীর। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং আমেরিকার সর্ববৃহৎ আন্ডারগ্রাউন্ড লেক বা মাটির নিচের হ্রদ এই লস্ট সি।

The Lost Sea-এর চেয়ে ম্যাপ আয়তন বড়ো আছে শুধু আরেকটা মাটির নিচের হ্রদ- নামিবিয়ার ড্রাগন'স ব্রিদ কেইভে। সেটার আয়তন ৪.৯ একর, অর্থাৎ Lost Sea-এর চেয়ে সেটা মাত্র ০.৪ একর বড়ো।

The Lost Sea হ্রদে পরীক্ষামূলকভাবে মাছ ছাড়া হয়েছিল। কেবল একটা প্রজাতির মাছ বেঁচে আছে মাটির এতটা নিচে অন্ধকার হ্রদের নীল পানিতে– রেইনবো ট্রাউট। তবে মাছের কোনো প্রাকৃতিক খাবারের উৎস নেই মাটির অত নিচে। তাই এই গুহার দায়িত্বে থাকা কর্মীরাই মাছগুলোকে খেতে দেন।

মাটির এত নিচেও এই নীল জলের হ্রদে নৌকায় ঘোরার ব্যবস্থা আছে। এটা টিকেটের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমাদের ট্যুর গাইড আমাদের সবাইকে নৌকায় করে ঘুরিয়ে নিয়ে এল অন্ধকার হ্রদ। বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় দেখা যায় নিচে হ্রদের নীল পানি, উপরে গুহার গায়ে নানা রকম ফর্মেশন। এ যেন এক অন্য পৃথিবী! গভীর গুহার নিচে হারিয়ে যাওয়া এক সমুদ্র! ■

শিক্ষার্থী, গেটিসবার্গ কলেজ, পেনসিলভেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

দেশের মায়া

নাঈমুল হক লিটন

ষড়ঋতুর দেশ
রূপের নেই যে শেষ।
সবুজ-শোভায় জুড়ায় আঁখি
গাছে গাছে ডাকে পাখি।
ঝিলের মাঝে শাপলা-শালুক
ঝোপের আড়ালে ডাকে ডাহুক।
নদীর বুকে নৌকা চলে
মাঠে সোনার ফসল ফলে
রাখালিয়া বাশির সুরে
মন যে আমার কাড়ে।
সবুজ শ্যামল মায়ায়
হাতছানি দেয় আমায়।

৮ম শ্রেণি, আবদুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়
মাদারটেক, ঢাকা

কবিতাগুচ্ছ

পাঠশালাতে যাব

গাজী আরিফ মান্নান

পাঠশালাতে পড়তে যাব
রিকশায় চড়ে আজ,
ব্যাগে ভরা বইও খাতা
সঙ্গে দারুণ সাজ।

শিখব আমি বর্ণ বানান
সাথে এক আর দুই,
হাসনাহেনা গোলাপ জবা
টগর বেলি জুঁই।

সবার আগে শিখব আমি
আমার পুরো নাম,
চিনবে সবাই এই নামেতে
আসবে বহু কাম।

লেখাপড়া শিখলে তবে
পাব অনেক দাম,
পাড়াপড়শি সবার মুখে
থাকবে যে সুনাম।

খুকুর বাগান

নূর আলম গন্ধী

ফুল পাখিদের বসছে মেলা
খুকুর বাগান জুড়ে
হাজার পাখি গাইছে যে গান
মিষ্টি মধুর সুরে।

এমন ক্ষণে খুকুমণি
আনন্দে আজ মেতে
হার মেনেছে তারই সাথে
ঝরনাধারাও যে।

খুশির জোয়ার বইছে আরও
খুকুর সারা গাঁয়
সেই খুশিতে গাঁয়ের সবে
সুখের পরশ পায়।

সুখের পরশ ভোলায় সবার
দুঃখ ব্যথা গ্লানি
খুকুমণির বাগান অমন
সুখ দিলো যে আনি।

ক্ষণিকের অতিথি

আনোয়ারুল হক মিন্টু

শিউলি ফুল শিউলি ফুল,
তোমায় চিনতে হয় না ভুল।
সাদার আর কমলার রেশ,
দেখতে কিন্তু লাগে বেশ।
শিশির ভেজা দূরবা ঘাসে,
থাকো তুমি সিন্ধ সাজে।
আকুল করা গন্ধ তোমার,
হারিয়ে যায় মন আমার।
ক্ষণিকের অতিথি তুমি,
সারা বছর অপেক্ষায় থাকি আমি।

প্রকৃতি হাসে

হামিদ রিপন

শ্রাবণ শেষে ভাদ্র আসে
সাদা শুভ্রতায় প্রকৃতি হাসে
অসীম দিগন্তের নীলাকাশে
তুলো মেঘ ভাসে!
সবুজ বন বনানি যেন
প্রাণ খুলে হাসে!
ডানা মেলে চিলেরা ওড়ে
গোধূলির লাল আবীরে!
সাদা নীলে দারুণ মিলে
স্বচ্ছ ছায়া দীঘির জলে
পাকা তালে হবে পিঠা
খেতে লাগে বড়োই মিঠা

একাদশ শ্রেণি,
মতিঝিল সরকারি বালক বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

বর্ষার নিমন্ত্রণ

ওলি মুন্সী

বৃষ্টি ভেজা ঢাকায় শহর
আকাশ ভরা মেঘ
তার উপরে উড়ছে পাখি
এরোপ্লেনের বেগ।

বৃষ্টি জলে ছলাৎ ছলাৎ
চারদিকে হইচই
গাড়িগুলো যাচ্ছে ঠিকই
নাউয়ের সারি কই?

বৃষ্টি জলে নাউয়ের সারি
দেখতে যদি চাও
বালই ব্রিজে ঘুরতে এসো
গোবিন্দশ্রী গাঁও।

খেঁকশিয়ালের বিয়ে

শাহজাহান মোহাম্মদ

রোদ আকশে বৃষ্টি পড়ে
খেঁকশিয়ালের বিয়ে
সেই খুশিতে ছুটছে হুতুম
বরণডালা নিয়ে।

প্রজাপতি পাখনা মেলে
নাছছে ফুলে ফুলে
পায়রার দল গীত গায় আর
মৌমাছিরা দোলে।

হলুদ বাটে ইঁদুরছানা
গায়েতে রং মেখে
ক্ষীর রেঁধেছে বিড়ালভায়া
কে দেখবে চেখে?

প্রিয়-প্রমি নাও এনেছে
রামসাগরের বাঁকে
বর যাত্রায় সোনাব্যাঙ
ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ ডাকে।

বিয়ের পীড়ি বসে বর
রুমাল মুখে নিয়ে
যৌতুক ছাড়াই হচ্ছে বিয়ে
এই স্লোগান দিয়ে।

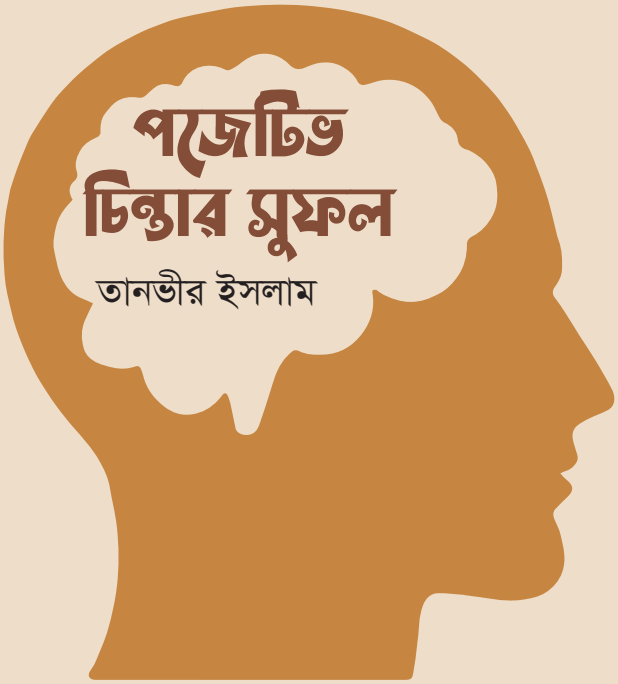

পজেটিভ চিন্তার সুফল

তানভীর ইসলাম

জীবনকে সুন্দর, আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা কে না চাই? আমরা সবাই চাই, আমাদের জীবন সুন্দর, আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক। জীবনকে সুন্দর, আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে পজিটিভ চিন্তার গুরুত্ব খুবই বেশি। নেতিবাচক চিন্তা আমাদের দেহ ও মনকে সর্বদাই খারাপ দিকে ঠেলে দেয়। একটা পজিটিভ চিন্তা মন শরীর এবং আমাদের চারপাশকে সুন্দর এবং সুস্থ রাখে। আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়। সামনে এগিয়ে যেতে কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পজিটিভ চিন্তা আমাদেরকে তার নিজের উৎসাহে পার করিয়ে দেয়।

● জীবনে ভালো কিছু করতে হলে ভালো কিছুর প্রত্যাশা করতে হয় অর্থাৎ ভালো কিছু করার পূর্বশর্ত হচ্ছে ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই ভালো কিছুর প্রত্যাশা আমাদেরকে বাড়িয়ে দেয় ইতিবাচক চিন্তা। ইতিবাচক চিন্তায় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি হতাশা দূর হয় এবং মস্তিষ্ক সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সক্ষমতা পায়।

● জীবনে চলার পথে অনেক বিপদ আসতে পারে। বিপদ আসাটা স্বাভাবিক। তবে বিপদকে ভয় না করে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা খুবই কঠিন। এই কঠিন কাজকে অনেক সহজ করে দেয় একটা ইতিবাচক চিন্তা। একটা ইতিবাচক চিন্তা একটা বিপদের সময় মানুষের আত্ম সাহস এবং কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি করে। যার ফলে সেই কাজটি খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

● দুশ্চিন্তায় আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বাঁধে। পাশাপাশি দুশ্চিন্তায় আমাদের শরীর ও মন খারাপ থাকে। যার ফলে আমাদের স্বাভাবিক দিনগুলো কাটাতে আমরা খুবই কষ্টে ভোগি। কিন্তু পজিটিভ চিন্তায় আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আমরা অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকি। পজিটিভ চিন্তা আমাদের শরীরের কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয়া এবং সাথে রক্তচাপ কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে তোলে।

● শারীরিক স্বাস্থ্যের মতো মানসিক স্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যে-কোনো কাজে আমরা মানসিক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারি না। যেটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। কিন্তু ইতিবাচক চিন্তা অর্থাৎ পজিটিভ চিন্তা মানসিক দিক থেকে বেশ প্রশান্তি দেয়, যার দরুন আমরা কাজের স্পৃহা পাই এবং নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারি। যে-কোনো কাজে আমরা মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়লে কিংবা মানসিক দিক থেকে পিছনে থাকলে আমরা কখনো সে কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারব না। তাই মানসিক প্রশান্তিতে থাকলে দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ অনেক ভালোভাবে তথা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

● ইতিবাচক চিন্তা আমাদেরকে বিশেষ কিছু দিক থেকে সহ্য শক্তি বৃদ্ধি করে। আমাদের জীবনে আমরা অনেক সময় আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল থেকে ছিটকে পড়ি। সে সময়ে আমরা নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারি না। কিন্তু ইতিবাচক চিন্তা আমাদেরকে সহ্য করা শেখায় এবং আমাদের সহ্য করার ক্ষমতাকে অনেক বৃদ্ধি করে।

● আমরা যখনই পজিটিভ চিন্তা করি তখন আমাদের মন ভালো থাকে এবং আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুস্থ মন নিয়ে চিন্তা করলে তার সাফল্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

● পজিটিভ চিন্তা কোনো কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে। একসময় পজিটিভ চিন্তা নিজের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। যখন পজিটিভ চিন্তা থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পাই তখন আমাদের কর্মের উদ্দীপনা বৃদ্ধি হয়। ■

এসএসসি শিক্ষার্থী, কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা কুড়িগ্রাম

ঋতুরানি শরৎ

হারুন-উজ-জামান

সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের পরতে পরতে রয়েছে সুন্দরের অনুপম ছোঁয়া। প্রকৃতির বিচিত্র রূপের উপর ভিত্তি করে বাংলা বছরকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ছয় ভাগের প্রতিটি ভাগকে বলা হয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই হলো ছয়টি ঋতু। দুই মাসে একটি ঋতু। ঋতুভেদে মাসগুলো হলো : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল। আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল। ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল। পৌষ-মাঘ শীতকাল। আর ফাল্গুন- চৈত্র বসন্তকাল। প্রতিটা ঋতুতেই প্রকৃতির রূপ ভিন্ন ভিন্ন। ভাদ্র-আশ্বিন দু'মাস শরৎকাল। আর শরৎকালকে বলা হয় ঋতুরানি। প্রকৃতির মোহনায় রূপের জন্য এ নাম দেয়া হয়েছে।

শরৎকালে শিমুল-তুলোর মতো আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা সাদা মেঘ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা দেখে লিখেছেন-

'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা রে ভাই,
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।'

দুর্বাঘাস ভিজে যায় হালকা শিশিরে। ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু মুক্তোর মতো চিকচিক করে সকালের রোদে। নদীর পাড়, বিল-ঝিল কিংবা জলাশয়ের

ধারে ফোটে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা সাদা কাশফুল। একটু বাতাসেই দোলে ওঠে পুরো কাশবন। কাশফুলের মৃদু দোলা যে-কারো মনকে নিমিষেই করে আপ্লুত। ঋতুর কথা ভুলে গেলেও কাশফুল দেখেই বুঝা যায়- শরৎ এসেছে। এ মৌসুমে ফোটে নানা রকমের বিচিত্র ফুল। বিলে-ঝিলে ফুটে থাকে সাদা-লাল শাপলা। গগন শিরীষ, হিমঝুরি, ছাতিম, বেলি, কামিনী, পদ্ম, বকফুল, জুঁই, বরইফুল, দোলনচাঁপা, জারুল, নয়নতারা, কেয়া, মল্লিকা, ধুতুরা, শিউলি, শেফালি, মিনজিরি, জবা, মাধবী, ঝিঙ্গেফুল, রাধাচুড়া, মালতি, বোগেনভেলিয়ার সমারোহে এ সময় নতুন করে সেজে ওঠে প্রকৃতি। এমনি এক শরৎকে বন্দনা করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন–

"এসো শারদ প্রাতের পথিক এসো শিউলি বিছানো পথে। এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে এসো অরুণ-কিরণ রথে"

শরতে মাঠে মাঠে বেড়ে ওঠে আমন ধানের চারা। আকাশ থাকে পরিষ্কার। রাতের আকাশে বসে তারার মেলা। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো চারদিকে ছড়ায় রূপের মায়াবি বন্যা। আবার বাঙালি হিন্দুদের অন্যতম বড়ো ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উদযাপিত হয় এ ঋতুতে।

শরৎ মানেই পাকা তাল। ঘরে ঘরে ধুম পড়ে যায় তালের পিঠার। তাল দিয়ে তৈরি পিঠা আর পায়েস খেতে খুব স্বাদ। অবশ্য তাল ছাড়াও আমলকি, জলপাই, ডুমুর, অরবরই, করমচা, চালতা, ডেউয়া ইত্যাদি জিভে জল আসা এসব অসাধারণ ফল পাওয়া যায় এ মৌসুমে।

বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিতে শরৎ আসে অপূর্ব এক নান্দনিক উৎকর্ষতা নিয়ে। শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি/ ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি' –কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো শরতে মুগ্ধ বাঙালি। ঋতুরানি শরৎ যুগে যুগে বাঙালির হৃদয়ে জাগাবে বিমুগ্ধ চেতনার অনাবিল ঢেউ। ■

সাংস্কৃতিক ও অধিকার কর্মী

শুভ্র শরৎ

তোফাজ্জল হোসেন তুহিন

ভাদ্র শেষে আসে আশ্বিন
প্রকৃতি সাজে শুভ্র সাদায়
শুরুতে ভাদ্র, শেষ হয় আশ্বিনে
শরতের বায়ু প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

আকাশ পানে ঘুরে বেড়ায়
সাদা মেঘের ভেলা ভেসে
নদীর তীরে কাশবনেরা
চিবুকে মুখ উঁচিয়ে দুলে উঠে।

চাষির কণ্ঠ বেজে উঠে
পাল তোলা নৌকায়
শরতের শুভ্র হাওয়ায়
কাশফুলেরা নেচে যায়।

মেঘের ভেলা

জেরিন আলম

নীল আকাশে ভেসে বেড়ায়
সাদা মেঘের ভেলা
এপাশ থেকে ওপাশে
ঘুরছে সারাবেলা।

আকাশ পানে ডানে বামে
উড়ছে তুলার মতো
ছোট্ট খোকা হাত বাড়িয়ে
ওই যে বাবা তুলো উড়ছে শত শত।

২য় বর্ষ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আব্দুস সাত্তার খান

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হলো জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কো ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর সব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬৬ সালের ২৬শে অক্টোবর ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ১৪তম অধিবেশনে ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখকে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মতো দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে ১৯৭২ সাল থেকে। দিবসটির লক্ষ্য ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং সমাজের কাছে সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরা। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সবগুলো রাষ্ট্র এ দিবসটি উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতি বছর পালিত হয়। সাক্ষরতার সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষার সঙ্গে উন্নত জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশ্বে পনেরো বা তার বেশি বয়েসিদের সাক্ষরতার হার ৮৬.৩ শতাংশ, তার মধ্যে পুরুষ ৯০ শতাংশ এবং নারী ৮২.৭ শতাংশ। ২০০৬ সালে ইউনেস্কোর গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকায় সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম। বিশ্বে যেসব দেশ সবচেয়ে কম সাক্ষরতাসম্পন্ন তার মধ্যে রয়েছে বার্কিনা ফাসো (১২.৮ শতাংশ), নাইজার ১৪.৪ শতাংশ, এবং মালি ১৯ শতাংশ। ২০১৫ সালে এই হার কিছুটা বেড়েছে সাব সহারান আফ্রিকায় ৬৪ শতাংশ। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ সাক্ষরতা দশক ঘোষণা করে। ২০০৮ সালে এর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা যুক্ত করে 'সাক্ষরতা এবং স্বাস্থ্য' হিসেবে তা পালিত হয়েছে। ২০১১-১২ সালে এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'সাক্ষরতা ও শান্তি'।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হচ্ছে আর মেয়েদের শিক্ষা বৃত্তি তো আছেই। আমাদের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে ছয় থেকে দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো সাক্ষরতা বৃদ্ধির ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার ১৯৯১ সালে ৩৫.৩ শতাংশ ছিল। এরপর ২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুযায়ী, দেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে হয় ৫৯.৮২ শতাংশ। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৭৩.৯ শতাংশে। সাক্ষরতাকে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং মানব উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ধরা হয়। কারণ দারিদ্র্যতা হ্রাস, শিশুমৃত্যু রোধ, সুষম উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি খুবই জরুরি।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশে শুধু শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাই নয়, জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ৪ নম্বরে। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও ও সুশীলসমাজ এসডিজির ৪ নম্বর লক্ষ্য নিয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জিত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাজটি সহজ হয়ে যাবে বলা যায়। ■

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

অপরাজিত বাবা ও ছেলে

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২৮তম আন্তর্জাতিক দাবা ফেস্টিভালের ফ্যামিলি প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের বাবা ও ছেলে জুটি। তারা হলেন গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান ও ছেলে ফিদে মাস্টার তাহসিন তাজওয়ারের দল । র‍্যাপিড পদ্ধতির খেলায় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়ার ফ্যামিলি দল ৭ খেলায় পূর্ণ ১৪ পয়েন্ট পেয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

২২শে আগস্ট অনুষ্ঠিত ফ্যামিলি প্রতিযোগিতায় জিয়ার ফ্যামিলি প্রথম রাউন্ডে ২-০ গেম পয়েন্টে ভারতের কাঞ্চনা দেবী ফ্যামিলিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে ১.৫-০.৫ গেম পয়েন্টে ফিলিপাইনের আবুসিজো আরমেল ফ্যামিলিকে, ও তৃতীয় রাউন্ডে ২-০ গেম পয়েন্টে ফিলিপাইনের রিয়েস ডেনিলোর ফ্যামিলিকে হারান।

পরের রাউন্ডগুলোতেও জিয়া-তাহসিনের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। চতুর্থ রাউন্ডে ১.৫-০.৫ গেম পয়েন্টে পেরুর গ্র্যান্ডমাস্টার কাস্তানেদা গিওরগিইর ফ্যামিলিকে, পঞ্চম রাউন্ডে ২-০ গেম পয়েন্টে উজবেকিস্তানের মানসুরভ বোতির ফ্যামিলিকে, ষষ্ঠ রাউন্ডে ১.৫-০.৫ গেম পয়েন্টে মরক্কোর আন্তর্জাতিক মাস্টার তিসির মোহাম্মদ ফ্যামিলিকে এবং সর্বশেষ সপ্তম রাউন্ডে ২-০ গেম পয়েন্টে ভারতের দিনেশ চিটলাঙ্গে ফ্যামিলিকে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করেন।

এছাড়া একই সঙ্গে চলা মাস্টার্স ইভেন্টের পঞ্চম রাউন্ডের খেলা শেষে ৫ খেলায় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান ও আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ৩ পয়েন্ট করে, ফিদে মাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া দুই পয়েন্ট ও ফিদে মাস্টার মেহেদী হাসান পরাগ ১ পয়েন্ট অর্জন করেছেন। ■

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

সবুজ পাসপোর্ট গার্ল

সবুজ পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের ১৩০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন বাংলাদেশের মেয়ে কাজী আসমা আজমেরী। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বকনিষ্ঠ নারী বিশ্ব পর্যটক হিসেবে সর্বশেষ ক্যারিবীয় অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্র সেন্ট লুসিয়া ভ্রমণের মাধ্যমে বিরল গৌরব অর্জন করেন।

ঘুরে বেড়ানোর প্রবল শখ আর আগ্রহকে পুঁজি করে ২০০৯ সালে বেরিয়ে পড়েন বিশ্ব ভ্রমণে। নেপালকে দিয়ে শুরু হয়েছিল তার সফর। ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সাল– এই দীর্ঘ তেরো বছরের পথ পরিক্রমায় বিশ্বের ১৩০টি দেশ ভ্রমণ শেষে তার ইচ্ছা আগামী ২ বছরের মধ্যে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ঘুরে দেখার।

বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টধারী হয়ে বিশ্বের অতগুলো দেশ ঘুরে দেখা মোটেই সহজ বিষয় ছিল না আসমা আজমেরীর জন্য। একে তো নারী তার ওপর সবুজ পাসপোর্টধারী। পদে পদে এসেছে বাধা, সৃষ্টি হয়েছে নানান জটিলতা। দু-একবার ইমিগ্রেশনে জেলও খাটতে হয়েছে তাকে। তবু তিনি দমে যাননি। ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বকে দেখার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে।

চাকরির সুবাদে আসমা আজমেরী নিউজিল্যান্ড বসবাস করলেও সে দেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করেননি। তিনি বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট ব্যবহার করেছেন শুধু বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য। যদিও এই পাসপোর্ট দিয়ে বিশ্বের অনেক দেশের ভিসা পাওয়া খুবই কষ্টকর ও দুর্লভ,। তবুও সবুজ পাসপোর্টকে সম্মানজনক স্থানে নিয়ে যেতে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন এ ভ্রমণটাকে। এক সাউথ আফ্রিকার ভিসা পেতেই দশ বছর লেগেছিল। যদিও তিনি জানতেন নিউজিল্যান্ডের পাসপোর্ট থাকলে কোনো দেশের ভিসা পেতেই সমস্যা হতো না।

আসমা আজমেরী খুলনার মেয়ে। খুলনায় এসএসসি, এইচএসসি শেষে পড়াশোনা করেছেন ঢাকায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর চাকরির সুবাদে নিউজিল্যান্ডে বসবাস। রেডক্রসে কাজ করেছেন, যুক্ত আছেন রোটারি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে স্কুলে-কলেজে-প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করতে ভ্রমণের গল্প শোনান আজমেরী।

নারী হিসেবে এত দেশ ভ্রমণ করার কারণে বিবিসি বাংলা, জার্মানি, সুইডেনের রেডিও, উজবেকিস্তানের টিভি রাশিয়ার পত্রিকা, ভারতের আনন্দ বাজার, টাইমস অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদিসহ দেশের অনেক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার ভ্রমণকাহিনি।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এই যে তিনি ১৩০ টি দেশ ঘুরেছেন সেটা কিন্তু তার নিজের উপার্জিত টাকায়। প্রতি দেড় বছর চাকরি করে টাকা জমান তিনি। পরের ছয় মাস সেই টাকা দিয়ে ভ্রমণে বের হন।

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে যে দেশেই গেছেন নিজের দেশের সবুজ পাসপোর্টটি তুলে ধরেছেন সবার আগে। তাই তিনি আন্তর্জাতিক মহলে আখ্যায়িত হয়েছেন 'পাসপোর্ট গার্ল' হিসেবে। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

শিশুদের করোনার টিকা

দেশের ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুদের পরীক্ষামূলকভাবে করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে । পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর ২৬শে আগস্ট থেকে পুরোদমে ১২টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ১১ই আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ টিকা কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষামূলকভাবে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ১৬ জন শিক্ষার্থীকে করোনার টিকা দেওয়া হয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর ২৬শে আগস্ট থেকে সারা দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনে গণহারে শিশুদের টিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরে পর্যায়ক্রমে জেলা-উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও টিকা দেওয়া হবে।

করোনা প্রতিরোধে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুদের জন্য ফাইজারের বিশেষ টিকা দেশে আসে গত ৩০শে জুলাই। ওইদিন বিশেষভাবে তৈরি ফাইজারের ১৫ লাখ ২ হাজার ৪০০টি ডোজ টিকা এসেছে। সরকার গত এপ্রিল মাসেই ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুদের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। দেশে এই বয়সি শিশুদের অনুমিত সংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ। ■

প্রতিবেদন : মো. জামালউদ্দিন

শিশুদের নতুন ওয়েবসাইট

ইদানীং শিশুরা স্মার্টফোন ছাড়া খেতে চায় না, ঘুমাতে চায় না; এমনকি পড়তেও চায় না। তাই শিশুদের লেখাপড়া নিয়ে অভিভাবকদের চিন্তার যেন শেষ নেই মা-বাবাকে এই দুশ্চিন্তা মুক্তি দিতে শিশুদের 'পড়া শেখার' নতুন ওয়েবসাইট এনেছে গুগল। এটি রিড অ্যালং– এর ব্রাউজার সংস্করণ। এই ওয়েবসাইটের বিশেষত্ব হচ্ছে, সাইটের বিভিন্ন ধাপে আছে শত শত 'ইলাস্ট্রেটেড স্টোরি' বা চিত্রযুক্ত গল্প, যা থেকে শিশুরা গল্প বাছাই করে সেগুলো পড়তে পারবে নিজস্ব ডিভাইসের মাইক্রোফোনে। শিশুরা ফোনের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা গল্প জোরে পড়লে ডিজিটাল বন্ধু 'দিয়া' গুগলের টেক্স-টু-স্পিচ ও উচ্চারণ চিহ্নিত করার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বলে দেবে, শিশুটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ করছে কিনা। তাদের পড়ে ফেলা শব্দগুলো নীল রংয়ে 'হাইলাইট' এবং ভুল উচ্চারণ করা শব্দ নিচে লাল রংয়ের 'আন্ডারলাইন' হয়ে যাবে। আন্ডারলাইনকৃত শব্দে ক্লিক করলে 'দিয়া' নামে পরিচিত একটি 'ভার্চুয়াল সহকারী' শিশুকে সঠিক উচ্চারণটি জানিয়ে দেবে। বাচ্চারা দক্ষতা অর্জন করে লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে ডিজিটাল পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া কোনো শব্দ পড়তে গিয়ে আটকালে যে-কোনো সময় 'দিয়া'র পরামর্শ নিতে পারবে। সাইটের বিভিন্ন ধাপে আছে শত শত ইলাস্ট্রেটেড গল্প বা ছবি, যা থেকে শিশুরা বাছাই করে পড়তে পারবে নিজস্ব ডিভাইসে। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, হিন্দি, গুজরাটি, তেলেগু, মারাঠি, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায় মিলছে এ সেবা। অ্যাপটি প্রসঙ্গে গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই বলেন, 'রিড অ্যালং অ্যাপটির মাধ্যমে শিশুদের পড়ার দক্ষতা বাড়বে। ১৮০টি দেশে মোট ৯টি ভাষায় এই অ্যাপ অাত্মপ্রকাশ করেছে। এই অ্যাপে শিশুরা কোনো গল্প জোরে জোরে পড়লে তার ভিজ্যুয়ালও দেখতে পারবে। 'রিড অ্যালং' –এর সংগ্রহে বেশ কয়েকটি নতুন গল্প যোগ করেছে গুগল। শিশু উপযোগী ভিডিও নির্মাতা 'ইউএসপি স্টুডিও' এবং 'চুচু টিভি'র কনটেন্ট নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের উপযোগী করে আনার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'কুটুকি'র বর্ণমালা ও ধ্বনিবিদ্যা বিষয়ক বইও এনেছে অ্যাপটি।

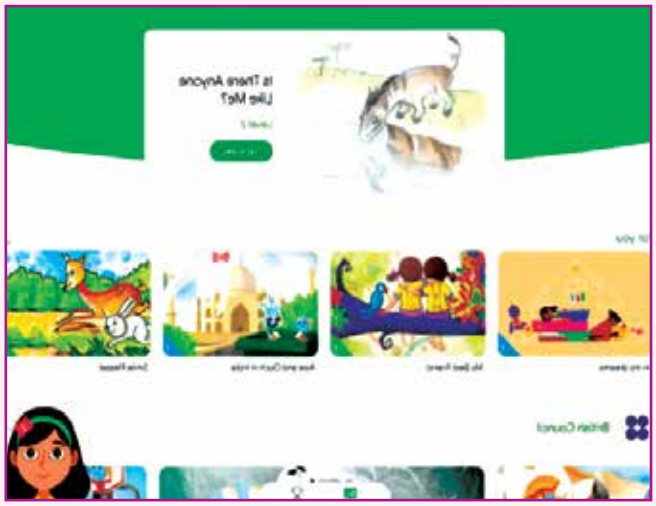

২০১৯ সালে চালু করা 'রিড অ্যালং'-এর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ব্যবহার করেছে তিন কোটির বেশি শিশু। সবার আগে রিড অ্যালং অ্যাপটি আসে ভারতে। তার নাম ছিল 'বোলো'। দ্রুত এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অভিভাবকদের থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মেলে। এরপরই বিশ্বব্যাপী নতুন করে অ্যাপটি আনার সিদ্ধান্ত নেয় গুগল। এ ধরনের একটি পদক্ষেপকে কম বয়সি শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষকরা। বিশেষ করে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য এটি দারুণ কাজের হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গুগল বলছে, এটি বাচ্চাদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে সাহায্যে করবে এবং যেসব বাবা-মা সন্তানদের সময় দিতে পারেন না তাদের উপকারে আসবে।■

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

নতুন উচ্চতায় আইফেল টাওয়ার

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা আরও ছয় মিটার (১৯ দশমিক ৬৯ ফুট) বাড়ানো হয়েছে। কারণ এর চূড়ায় নতুন একটি ডিজিটাল রেডিও ব্রডকাস্টিং অ্যান্টেনা বসানো হয়েছে। এখন বিখ্যাত স্থাপনাটির উচ্চতা দাঁড়ালো ৩৩০ মিটার। দশ মিনিটেরও কম সময়ে ১৫ই মার্চ একটি হেলিকপ্টারের সহায়তায় ফরাসি রেডিও প্রতিষ্ঠান টেলিডিফিউজন দ্য ফ্রান্সের ডিএবিপাস নামের (ডিজিটাল অডিও) অ্যান্টেনাটি যুক্ত করে আইফেল টাওয়ারে।

আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ২২ বছর আগে আরেকবার একটি অ্যান্টেনা স্থাপনের ফলে এর উচ্চতা বেড়েছিল।

১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে পেটা-লোহা দিয়ে বানানো হয় আইফেল টাওয়ার। এর স্থপতি ফ্রান্সের গুস্তাভ আইফেল।

আইফেল টাওয়ার পৃথিবীর প্রথম টাওয়ার যেটিকে শুধুমাত্র প্রতীক এর জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল কোনো রকম বাণিজ্যিক ভাবনা ছাড়াই। আর এই টাওয়ারটি দীর্ঘ ৪০ বছর পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বিল্ডিং বা টাওয়ারের মর্যাদা ধরে রেখেছিল। তাই আইফেল টাওয়ার যদি নিজের উচ্চতা বাড়ায়, তবে তা মানুষকে যে অবাক করবে, সেটাই স্বাভাবিক। ■

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ছোটোদের আঁকা

মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ, নার্সারি শ্রেণি, অক্সফোর্ড ক্যাডেট অ্যান্ড হাই স্কুল, শ্যামপুর, ঢাকা

সাবিহা তাসবীহ, সপ্তম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা

মীনার লড়াই

হোমায়েদ নাসের

শিশুদের অধিকার রক্ষার সচেতনতা বাড়াতে ১৯৯৮ সাল থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর মিনা দিবস পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল ছিল মেয়েশিশুর দশক। বাংলাদেশে শহরের প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং গ্রামের ৮১ শতাংশ শিশু ও কিশোর-কিশোরী মীনাকে চেনে। মীনা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর নয় বছরের একটি মেয়ে, যে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। হোক তা তার স্কুলে যাওয়ার বিষয়ে অথবা শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

লিঙ্গ, শিশু অধিকার, শিক্ষা, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে মীনাকে ব্যবহার করা হয়। মীনার গল্পগুলোতে মেয়েদের সমান অধিকার,ভালোবাসা, সেবা ও মর্যাদা অর্জনের জন্য সব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে একটি মেয়ের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়। সৃষ্টিশীল ও চমকপ্রদ গল্পে আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর উপস্থাপনে নানা সামাজিক সংকট তুলে ধরা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েশিশুদের প্রতীক হচ্ছে মীনা। সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি। নয় বছরের মেয়েটির কাজই হলো কীভাবে সবার ভালো হবে, তা দেখা। মীনার জন্ম ১৯৯২ সালে। দেখতে দেখতে ৩০ বছর পার হলেও মীনা আটকে আছে সেই নয় বছরেই। মীনার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা হিসাব করে ১৯৯৮ সালে সার্কের পক্ষ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরকে মীনা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

হাত ধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার,বন্যার সময় করণীয়, মেয়েদের নিরাপত্তা, শিশুর ডায়রিয়া হলে করণীয়,শহরে গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন রোধ ও শিক্ষার সুযোগ প্রভৃতি বিষয়কে মীনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এতে করে শিশুসহ সব বয়সি মানুষের ভেতরে আত্মসচেতনতা জেগে ওঠে।

ইউনিসেফ বাংলার সাথে হিন্দি উর্দুসহ ২৯ টি ভাষায় মীনা কার্টুন তৈরি। কার্টুনের মূল চরিত্র মীনা বিভিন্নভাবে শিশুদের অধিকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার চিত্র তুলে ধরে। একইসাথে সবার কাছে স্বাস্থ্য-সচেতনতা পরিবেশ-সচেতনতা এবং শিক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরেছে।

মীনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন কোনো শিশুকেই অবহেলা না করি। শিশুরা যেন ভবিষ্যতে সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যেই সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাহলেই আমরা দেশ ও জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াঁতে পারব। মীনার মাধ্যমে বিশ্বের সব শিশুদের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক-এই প্রত্যাশা আমাদের সবার। ■

প্রাবন্ধিক

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

এটি শহরের কোনো স্কুল নয়, দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার সাবেক গুলিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। যে বিদ্যালয়ের পুরো প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে সবুজ লতাপাতায় দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য দিয়ে। এখানে রয়েছে গাছ দিয়ে তৈরি বিশাল আকৃতির গেইট, শাপলা ও বসার জায়গায়। এমনকি গাছ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাতীয় পতাকা, শহিদ মিনারের আকৃতিও। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মনের মাধুরী দিয়ে ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সাজিয়েছেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস। এখন এলাকার মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই স্কুলটি। শুধু পর্যটক নয়, প্রতিদিন এ স্কুল পরিদর্শনে ছুটে আসছে আশপাশের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও। শিশুদের জন্য নান্দনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রধান শিক্ষকের এমন উদ্যোগে গর্বিত বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরাও। ব্যতিক্রমী এ স্কুলে পড়তে পেরে দারুণ খুশি শিক্ষার্থীরা।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার

ছোট্ট বন্ধু আবদুল্লাহ আল মুনায়েম। জন্ম থেকেই তার দুটি হাত নেই। শুধু পা দিয়েই লিখতে ও আঁকতে পারে ছবি। মুনায়েম পা দিয়েই এঁকেছে বঙ্গবন্ধুর ছবি। ছবি আঁকায় সারা দেশে প্রথম হয়ে পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারও। গত ঈদুল ফিতরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঈদের শুভেচ্ছা কার্ডে স্থান পেয়েছে আব্দুল্লাহর আঁকা ছবি। বঙ্গবন্ধু ও গ্রামবাংলাকে নিয়ে আঁকা ছবিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে এলে আব্দুল্লাহকে পুরস্কৃত করেন তিনি। নগদ এক লাখ টাকার সাথে আব্দুল্লাহকে দেওয়া হয় আড়াই শতাংশ জমির উপর একটি আধা পাকা টিনশেড বাড়ি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন জানতে পেরেছেন এত সুন্দর ছবি এমন একটি ছেলে আঁকে যার দুটি হাত নেই। পা দিয়ে আঁকে, তখন তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার মিদ্দারহাটের কামাল উদ্দিন ও বিবি কুলসুমের ছেলে মুনায়েম। তাকে বিনামূল্যে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন। দাগনভূঞা একাডেমির ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আবদুল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পেয়ে আনন্দিত মুনায়েম জীবনে অনেক বড়ো হতে চায়।

মোড়ে মোড়ে বই ঘর

বিস্ময়কর এক গ্রাম। যে গ্রামের মোড়ে মোড়ে রাখা আছে বুকশেলফ। বলছি ভারতের কেরালার কল্লাম জেলার কোত্তারাক্কারা শহর থেকে দূরের ছোট্ট এক গ্রাম পেরুমকুলামের কথা। এই গ্রামের পথে প্রান্তরে হাঁটতে হাঁটতে তোমরা পেয়ে যাবে বই ঘর। সেখানে বসে বই থেকে শুরু করে খবরের কাগজ সবই পড়তে পারবে। ২০১৭ সালে গ্রামটি 'বই গ্রাম' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। বই পড়ার সংস্কৃতি জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে শুরু হয় এই বই গ্রামের কার্যক্রম। পেরুমকুলামের বাসিন্দা কৃষ্ণা পিল্লাই নামে এক যুবক ও তার বন্ধুরা মিলে বইগুলো সংগ্রহ করেন। গ্রামটিতে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপন করে। নাম দেওয়া হয় 'বাপুজি মেমোরিয়াল লাইব্রেরি'। গ্রন্থাগারটি ১৯৫৭ সালে একটি নিজস্ব ভবন পেয়েছিল। এটি প্রতি বছর ৩২ হাজার রুপি রাষ্ট্রীয় ভাতা পায়। ১০০ বই নিয়ে শুরু হওয়া এ লাইব্রেরিতে আজ প্রায় ৮ হাজার বই রয়েছে। ২০১৬ সালের বর্তমান প্রজন্ম সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তার পাশে গড়ে তোলে ছোটো ছোটো বুকশেলফ। এক একটি বই ঘরে থাকে পঞ্চাশটি করে বই। বই নিয়ে পড়তে কোনো চার্জ দিতে হয় না। তবে এই বই ঘরে একটি বই রাখার মাধ্যমেই কেবল বই নিয়ে পড়তে পারবে যে কেউ।

হাঁসের বিশ্বরেকর্ড

হাঁস বাজায় ড্রাম! কী বন্ধুরা অবাক হচ্ছো? কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়ত দেখেছ একটি হাঁস দুই পা দিয়ে খুব সুন্দর করে ড্রাম বাজাচ্ছে। হাঁসটির নাম বেন অ্যাফকোয়াক। ইনস্টাগ্রামে তার ফলোয়ারের সংখ্যা ৭৯ হাজারেরও বেশি। বিশ্বরেকর্ডের তালিকায়ও আছে বেনের নাম। বেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটাতে তার মালিক ডেরেক জনসনের সঙ্গে থাকে। বেনকে তিনি খুব ছোটো থাকতেই এনেছিলেন। ইনস্টাগ্রামে বেনের সঙ্গে সঙ্গে ডেরেকও এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে– ডেরেক মিউজিশিয়ান। তিনি যখন স্টুডিওতে কাজ করতেন তখন বেন তার আশপাশে ঘোরাঘুরি করত। বিশেষ করে যখন তিনি ড্রাম বাজাতেন বেন তখন যেন একটু বেশিই আনন্দিত হয়ে যেত। এরপরই তিনি বেনকে ড্রাম বাজানোর প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। সেই ভিডিওটা ডেরেক ইনস্টাগ্রামে আপলোড করতেই ভাইরাল হয়ে যায়। ২০২০ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বেনকে বিশ্বরেকর্ডের স্বীকৃতি দেয়, যা এখনও ভাঙতে পারেনি কোনো হাঁস। দিন দিন বেনের ফ্যান-ফলোয়ার্স ও ড্রাম বাজানোর দক্ষতা বেড়েই চলেছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ৪. যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার নাম ৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রার নাম ৫. চীনের রাজধানী ৮. নামিবিয়ার রাজধানী।

উপর-নিচ: ১. কুয়েতের মুদ্রার নাম, ২. যুক্তরাজ্যের মুদ্রার নাম ৬. ক্যামেরুনের রাজধানী ৭. চিলির রাজধানী।

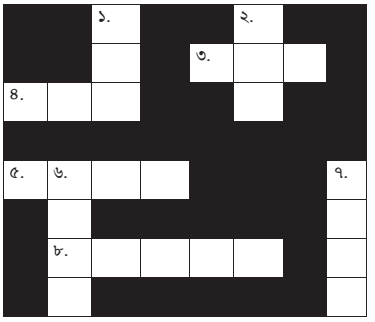

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: ইন্দোনেশিয়া, গম, বিরিশিরি, মগজ, টক, আবির্ভাব, নাসিকা, লার্ভা, বক, কলম, নামাজ, কটকা

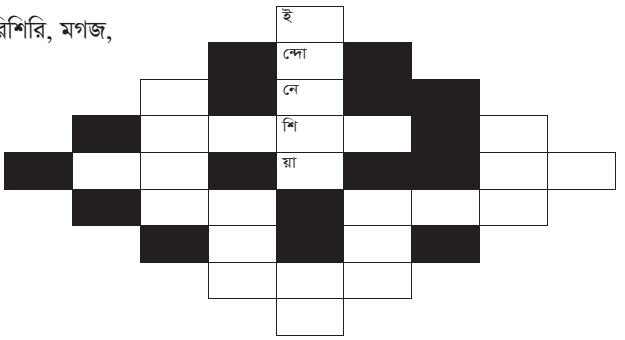

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৯	১০			৬৭		৬৫
	৭			৭৮	৮১		৬৯	
৩		১				৭৩		
	১৭	১৬			৭৫		৭১	
১৯			১৪	৪৫	৪৬		৬০	
	২১	৩০		৪৪		৪৮		৫৮
	২৮		৩২		৪২		৫৬	
	২৭	৩৪		৪০		৫০		৫৪
২৫		৩৫			৩৮		৫২	

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	*		*	১	=	
*		*		+		+
	*	৩	-		=	৪
-		+		/		+
৭	+		-	২	=	
=		=		=		=
	+	৬	+		=	১৬

আগস্ট মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

টুং			মু	জি	ব	ব	র্ষ
ঙ্গি					ন		
পা	ন	কৌ	ড়ি		ল	তি	কা
ড়া		তু			তা		ণ্ড
	ট	ক			সে		জ্ঞা
	স			জ্ঞা	ন		ন
খ	ট	ম	টে			না	
	সে		ন	জ	রা	না	

ছক মিলাও

				নি				
				রা				
		প	রো	প	কা	র		
		র		দ			কা	
অ	ব	শ		স	ড়	ক	বা	তি
		ম		ড়			ডি	
		ণি		ক	ল	ম		
					ব			

নাম্ব্রিক্স

৭১	৭০	৬৯	৬৬	৬৫	৬৪	৪৩	৪২	৪১
৭২	৭৩	৬৮	৬৭	৬২	৬৩	৪৪	৪৫	৪০
৮১	৭৪	৭৫	৬০	৬১	৫০	৪৯	৪৬	৩৯
৮০	৭৭	৭৬	৫৯	৫২	৫১	৪৮	৪৭	৩৮
৭৯	৭৮	৫৭	৫৮	৫৩	২২	২৩	৩৬	৩৭
৮	৯	৫৬	৫৫	৫৪	২১	২৪	৩৫	৩৪
৭	১০	১১	১২	১৯	২০	২৫	৩২	৩৩
৬	৩	২	১৩	১৮	১৭	২৬	৩১	৩০
৫	৪	১	১৪	১৫	১৬	২৭	২৮	২৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

১	*	৩	+	২	=	৫
+		*		*		*
৪	/	২	+	১	=	৩
/		-		+		-
২	*	৪	-	৩	=	৫
=		=		=		=
৩	+	২	+	৫	=	১০

ছোটোদের আঁকা

আফরা তাহমীদ জারা, চতুর্থ শ্রেণি, এস ও এস হারমান মেইনার কলেজ

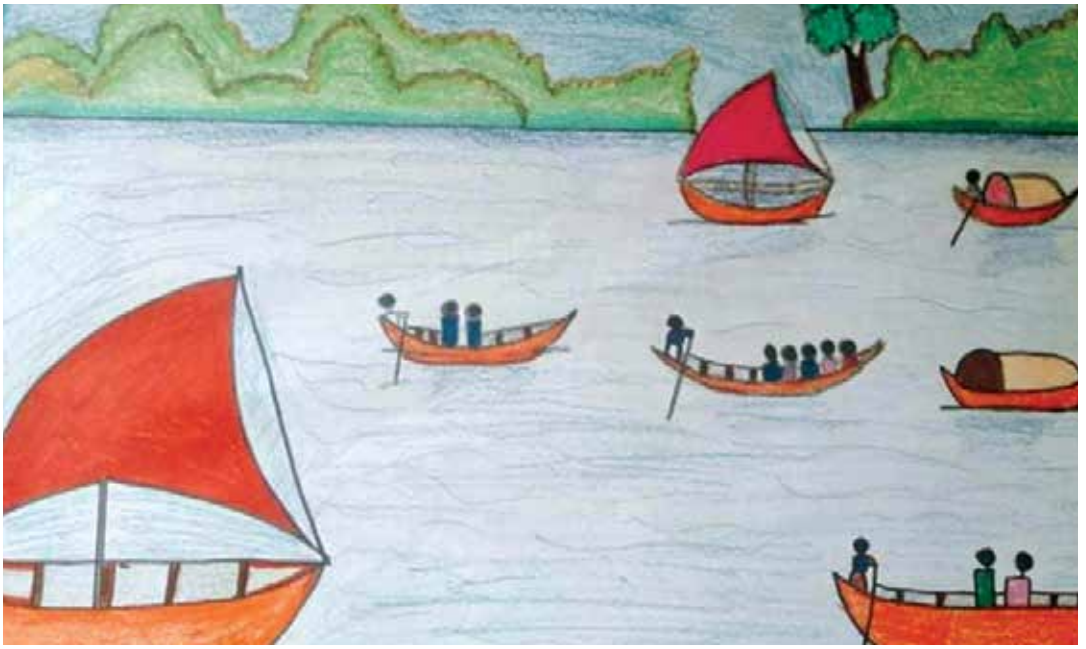

আয়ান হক ভূঁইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

সামিকা নূর ইমি, শ্রেণি : প্লে, স্কুল : চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

অর্থি, ২য় শ্রেণি, অ্যালাই কাডেট স্কুল, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-03, September 2022, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

সূর্যের আলোকেও হার মানায় শত সহস্র রক্তিম লাল শাপলা
যেন ফুলে ফুলে সাজানো লাল গালিচা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা